ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

শ্লোক ১

সূত উবাচ

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্ ।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **বিদুরঃ**—বিদুর; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—তীর্থ পর্যটন কালে; **মৈত্রেয়াৎ**—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **আগাৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **হস্তিনপুরম্**—হস্তিনাপুর নগরে; **তয়া**—সেই জ্ঞানের দ্বারা; **অবাপ্ত**—যথেষ্টভাবে লাভ করে; **বিবিৎসিতঃ**—জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, তীর্থ পর্যটন কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীবের পরম গতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে বিদুর হস্তিনাপুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ইষ্টবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর হচ্ছেন মহাভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট চরিত্র। তিনি মহারাজ পাণ্ডুর মাতা অম্বিকার এক দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন যমরাজের অবতার। মণ্ডূক মুনির অভিশাপে তাঁকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই কাহিনীটি হচ্ছে—

এক সময় রাজার সিপাহী মণ্ডূক মুনির আশ্রমে আত্মগোপনকারী কয়েকজন চোরকে ধরে। সিপাহীরা যথারীতি সেই চোরদের গ্রেপ্তার করে এবং সেই সঙ্গে মণ্ডূক মুনিকেও গ্রেপ্তার করে। বিচারক মুনিকে চোর সাব্যস্ত করে তাঁকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। মুনিকে যখন শূলে চড়ান হচ্ছিল, তখন সেই

সংবাদ রাজার কাছে পৌঁছায়, এবং রাজা তাঁকে একজন মহান্ মুনি বলে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন। রাজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কর্মচারীর এই ত্রুটির জন্য মুনির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

মুনি তৎক্ষণাৎ জীবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী যমরাজের কাছে যান। মুনির প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলেন যে, মুনি তাঁর শৈশবে তীক্ষ্ণ তৃণের দ্বারা একটি পতঙ্গকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং তার ফলে এই দণ্ড ভোগ করার উপক্রম হয়েছিল।

মুনি সে কথা শুনে মনে করেছিলেন, শৈশবের অজ্ঞানতাবশত এই স্বল্প অপরাধের ফলে এই গুরুদণ্ড দেওয়া যমরাজের পক্ষে অন্যায় হয়েছে, এবং তাই তিনি যমরাজকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর শূদ্র-ভ্রাতা বিদুর হচ্ছেন যমরাজের এই শূদ্ররূপী অবতার। ভীষ্মদেব কুরুবংশের এই শূদ্র-সন্তানটিকে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে সমভাবে প্রতিপালন করেন। যথাসময়ে বিদুর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সেই কন্যাটিও শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিদুর যদিও তাঁর পিতার (ভীষ্মদেবের ভ্রাতার) রাজ্য লাভ করেননি, কিন্তু তবুও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দান করেছিলেন। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, এবং সব সময় তিনি তাঁকে সৎপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন।

ভ্রাতৃঘাতী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিদুর পাণ্ডু-পুত্রদের প্রতি ন্যায্য বিচার করার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তাঁর পিতৃব্যের এই ধরনের চেষ্টা মোটেই পছন্দ করেনি এবং তাই সে বিদুরকে কার্যত অপমান করেছিল। তার ফলে, বিদুর গৃহত্যাগ করে তীর্থ-পর্যটনে যান এবং মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ লাভ করেন।

শ্লোক ২

যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌষারবাগ্রতঃ ।
জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥২॥

যাবতঃ—সেই সমস্ত; **কৃতবান্**—তিনি করেছিলেন; **প্রশ্নান্**—প্রশ্নসমূহ; **ক্ষত্তা**—বিদুরের আর একটি নাম; **কৌষারব**—মৈত্রেয়ের আর একটি নাম; **অগ্রতঃ**—উপস্থিতিতে; **জাত**—জাত; **এক**—এক; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তেভ্য**—সেই সমস্ত প্রশ্ন বিষয়ক; **চ**—এবং; **উপররাম**—বিরত; **হ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় মুনির কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার পর আরও প্রশ্ন করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিদুর যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হলেন গোবিন্দ, অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে তাঁর ভক্তসমূহের সন্তুষ্টিবিধান করে থাকেন, তাঁরই অপ্রাকৃত সেবায় অবশেষে যুক্ত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য, তখন তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয়েছিলেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবসত্তা, বদ্ধ জীবমাত্রেই জড়জাগতিক মানসিকতা নিয়ে, ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সুখের সন্ধান করে থাকে, কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না। সে তখন প্রয়োগলব্ধ দার্শনিক মনোধর্মপ্রসূত পদ্ধতি এবং জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরম সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু চরম লক্ষ্য খুঁজে না পেলে, সে আবার জড়জাগতিক কার্যকলাপের মধ্যে নেমে যায়, এবং নানা ধরনের জনকল্যাণকর এবং পরহিতব্রতী কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়, সেই সব কিছুই তার সন্তুষ্টিবিধানে ব্যর্থই হয়।

সুতরাং, সকাম কর্ম অথবা শুষ্ক দার্শনিক জ্ঞানের জল্পনা কখনই জীবকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না, কারণ গুণগতভাবে প্রতিটি জীবসত্তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র তাকে সেই চরম লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত করে থাকে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৫/১৫)* এই উক্তিটি প্রতিপন্ন করেছেন।

বিদুরের মতোই মৈত্রেয় ঋষির অনুরূপ আদর্শ সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কর্ম (ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম), জ্ঞান (পরম সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তত্ত্বগত গবেষণা) এবং যোগ (পারমার্থিক উপলব্ধির পথে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা, জিজ্ঞাসু বদ্ধ জীবাত্মার অবশ্যই কর্তব্য। গুরুদেবের কাছে প্রশ্নাদি উত্থাপন করতে ঐকান্তিকভাবে যারা আগ্রহী নয়, তাদের লোক দেখানো গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। তেমনই, কোনও গুরু যদি তার শিষ্যকে শেষ অবধি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চর্চায় নিযুক্ত করতে না পারে, তাকেও গুরুর ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার কোনও সার্থকতা নেই। মৈত্রেয় ঋষির মতো একজন আদর্শ সদ্গুরুর শরণাগত হতে পেরেছিলেন বিদুর এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ গোবিন্দের প্রতি ভক্তি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে পারমার্থিক বিষয়ে জানার আর কিছু ছিল না।

শ্লোক ৩-৪

তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্মপুত্রঃ সহানুজঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥ ৩ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী ।
অন্যাশ্চ জাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাকে; **বন্ধুম্**—আত্মীয়-স্বজন; **আগতম্**—সেখানে এসে; **দৃষ্ট্বা**—তা দেখে; **ধর্ম-পুত্রঃ**—যুধিষ্ঠির; **সহ-অনুজঃ**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে; **ধৃতরাষ্ট্র**—ধৃতরাষ্ট্র; **যুযুৎসুঃ**—সাত্যকি; **চ**—এবং; **সূতঃ**—সঞ্জয়; **শারদ্বতঃ**—কৃপাচার্য; **পৃথা**—কুন্তী; **গান্ধারী**—গান্ধারী; **দ্রৌপদী**—দ্রৌপদী; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **সুভদ্রা**—সুভদ্রা; **চ**—এবং; **উত্তরা**—উত্তরা; **কৃপী**—কৃপী; **অন্যাঃ**—অন্য সকলে; **চ**—এবং; **জাময়ঃ**—পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের পত্নীরা; **পাণ্ডোঃ**—পাণ্ডবদের; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনেরা; **স-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণসহ; **স্ত্রিয়ঃ**—মহিলারা।

অনুবাদ

যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী—মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, কৌরবদের আরও অনেক পত্নীগণ এবং সন্তানাদিসহ অন্যান্য মহিলারা সবাই মহানন্দে দ্রুত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা আবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন।

তাৎপর্য

গান্ধারী ঃ পৃথিবীর ইতিহাসে আদর্শ সতীসাধ্বী নারী। তিনি ছিলেন গান্ধারের (বর্তমান আফ্‌গানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের) রাজা সুবলের কন্যা। কুমারী অবস্থায় তিনি শিবের পূজা করেছিলেন। হিন্দু পরিবারের কুমারী কন্যারা ভাল স্বামী পাবার উদ্দেশ্যে সাধারণত শিবের পূজা করে। গান্ধারী শিবকে সন্তুষ্ট করেন, এবং শিবের বরে একশত পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেও তাঁর সঙ্গেই গান্ধারীর বিবাহ স্থির হয়েছিল।

যখন গান্ধারী জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাবী পতি অন্ধ, তখন তাঁর জীবন-সহচরের অনুগমন করার মানসে তিনি স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাই তিনি অনেকগুলি পট্টবস্ত্রের দ্বারা তাঁর চক্ষু আবৃত করেন, এবং তাঁর

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শকুনির তত্ত্বাবধানে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন সেই সময়কার সব চেয়ে সুন্দরী রমণী এবং নারীসুলভ সমস্ত গুণাবলীতে তিনি ভূষিতা ছিলেন, তাই তিনি কৌরব সভার প্রতিটি সদস্যের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন।

কিন্তু সমস্ত সদ্‌গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা তাঁর ছিল এবং তাই কুন্তী যখন এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন, তখন কুন্তীর প্রতি তিনি ঈর্ষাপরায়ণ হন। কুন্তী এবং গান্ধারী উভয় মহিষীই গর্ভবতী হন, কিন্তু কুন্তী প্রথমে পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে গান্ধারী তাঁর নিজের গর্ভে এক আঘাত করেন। ফলে, তিনি শুধুই এক মাংস-পিণ্ড প্রসব করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ব্যাসদেবের ভক্ত, তাই ব্যাসদেবের নির্দেশে, সেই মাংস-পিণ্ডটিকে একশত খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি খণ্ড ক্রমেই বর্ধিত হয়ে এক-একটি পুত্র-সন্তানে পরিণত হয়। এইভাবে তাঁর শত-পুত্রের জননী হওয়ার বাসনা পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাঁর সমুন্নত মর্যাদা অনুসারে তিনি সেই সমস্ত শিশুদের প্রতিপালন করতে থাকেন।

যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষড়যন্ত্র চলছিল, তখন তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে সেই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের জন্য দোষারোপ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করে পাণ্ডুপুত্রদের এবং তাঁর পুত্রদের দেওয়া হোক।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সন্তানদের মৃত্যু হওয়ায় তিনি অত্যন্ত শোকাতুরা হয়েছিলেন, এবং তিনি ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁকে নিরস্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তিনি যখন দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের মৃত্যুর জন্য করুণভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কর্ণের মৃত্যুতেও তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর্ণের পত্নীর শোকবিলাপ বর্ণনা করেছিলেন।

শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁকে দেখান যে, তাঁর মৃত পুত্ররা স্বর্গ-লোকে উন্নীত হয়েছেন, তখন তিনি শান্ত হন। গঙ্গার উৎস-মুখের সন্নিকটে হিমালয় পর্বতের অরণ্যে দাবানলে দগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানাদি সম্পাদন করেছিলেন।

পৃথা ঃ মহারাজ সুরসেনের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী। পরবর্তীকালে মহারাজ কুন্তিভোজ তাঁকে তাঁর পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তাঁর নাম হয় কুন্তী। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সাফল্য শক্তির প্রকাশ।

স্বর্গের দেবতারা মহারাজ কুন্তিভোজের প্রাসাদে আসতেন, এবং কুন্তী তাঁদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নে নিযুক্ত থাকতেন।

তিনি মহা যোগীপুরুষ দুর্বাসা মুনিরও সেবা করেছিলেন এবং তাঁর একান্ত সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে একটি মন্ত্র দান করেন, যার সাহায্যে তিনি যে কোন দেবতাকে তাঁর খুশিমতো আহ্বান করতে পারতেন। কৌতূহলের বশে, তিনি তৎক্ষণাৎ সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্যদেব তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং কুন্তীদেবীর সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু কুন্তী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সূর্যদেব তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, এবং তাই কুন্তী তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। এই মিলনের ফলে তিনি গর্ভবতী হন, এবং কর্ণের জন্ম হয়। সূর্যের কৃপায় তিনি পুনরায় তাঁর কুমারীত্ব ফিরে পান, কিন্তু পিতামাতার ভয়ে তিনি নবজাত শিশু কর্ণকে পরিত্যাগ করেন।

পরে যখন তিনি বাস্তবিক তাঁর পতি নির্বাচন করেন, তখন পাণ্ডুকেই তাঁর পতিরূপে মনোনয়ন করেন। মহারাজ পাণ্ডু পরে সংসার আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে মনস্থ করেন। কুন্তী তাঁর পতির এই সঙ্কল্প মেনে নিতে রাজী হননি, কিন্তু অবশেষে মহারাজ তাঁকে অন্য কোনও উপযুক্ত পুরুষকে আহ্বান করে পুত্রসন্তানাদির জননী হতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রথমে কুন্তী সেই প্রস্তাবে সম্মত হননি। কিন্তু পাণ্ডু যখন তাঁকে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তাদি দেখালেন, তখন তিনি সম্মত হয়েছিলেন। তাই দুর্বাসা মুনি প্রদত্ত মন্ত্রের সাহায্যে তিনি ধর্মরাজকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। তিনি বায়ুর দেবতা পবনদেবকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে ভীমের জন্ম হয়। তিনি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে অর্জুনের জন্ম হয়। নকুল ও সহদেব নামে অন্য দুটি পুত্র পাণ্ডুর নিজের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পরে, অল্প বয়সে মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হলে, কুন্তী এতই মর্মাহত হন যে, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কুন্তী এবং মাদ্রী, পাণ্ডুর উভয় পত্নী স্থির করেন যে, পাণ্ডুর পাঁচটি নাবালক পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুন্তীর জীবিত থাকা উচিত এবং মাদ্রী সতী প্রথা অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় তাঁর পতির সাথে সহমরণ বরণ করবেন। সেই উপলক্ষ্যে উপস্থিত শতসৃঙ্গ প্রমুখ মহর্ষিরা তাদের এই সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করেছিলেন।

পরে, দুর্যোধনের চক্রান্তে যখন পাণ্ডবেরা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হল, তখন কুন্তী তাঁর পুত্রদের সঙ্গেই ছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে সমানভাবে সকল রকমের

দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। বনবাসকালে হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসী ভীমকে পতিত্বে বরণ করতে চায়। ভীম তা প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু হিড়িম্বা যখন কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব রাখে, তখন তার মনোবাসনা পূর্ণ করে তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করার জন্য ভীমকে তাঁরা আদেশ দেন। এই মিলনের ফলে ঘটোৎকচের জন্ম হয় এবং সে অতি বীরত্ব সহকারে তার পিতার সাথে থেকে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

তাঁদের বনবাসকালে তাঁরা এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন; সেই পরিবারটি তখন বকাসুর নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে বিব্রত হয়েছিল, এবং কুন্তী সেই বকাসুরকে বধ করে ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্য ভীমকে আদেশ দেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাঞ্চালদেশে যেতে পরামর্শ দেন। দ্রৌপদীকে এই পাঞ্চালদেশেই অর্জুন লাভ করেন, কিন্তু কুন্তীর আদেশে পাণ্ডব ভ্রাতারা পাঁচজনেই সমভাবে পাঞ্চালী অর্থাৎ দ্রৌপদীর স্বামী হন। ব্যাসদেবের উপস্থিতিতে তিনি পঞ্চ-পাণ্ডবের সাথে বিবাহিতা হন।

কুন্তীদেবী তাঁর প্রথম সন্তান কর্ণকে কখনও ভোলেননি, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যুর পর তিনি আকুলভাবে বিলাপ করেছিলেন এবং তাঁর অন্যান্য পুত্রদের সমক্ষেই স্বীকার করেছিলেন যে, মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন কর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর প্রার্থনাবলী মনোরমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরে তিনি গান্ধারীর সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যা পালনের জন্য বনে গমন করেন। তিনি ত্রিশ দিন অন্তর একবার আহার গ্রহণ করতেন।

অবশেষে তিনি গভীর ধ্যানে উপবেশন করেন এবং পরে দাবানলে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়।

দ্রৌপদী ঃ মহারাজ দ্রুপদের অতীব সতীসাধ্বী কন্যা এবং ইন্দ্র-পত্নী শচীদেবীর অংশপ্রকাশ। যজমুনির তত্ত্বাবধানে মহারাজ দ্রুপদ এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর প্রথম যজ্ঞাহুতির সাহায্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়, এবং দ্বিতীয় যজ্ঞাহুতির দ্বারা দ্রৌপদীর জন্ম হয়। সেই হেতু তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তাঁর আর এক নাম পাঞ্চালী। পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই স্ত্রীরূপে বিবাহ করেন, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর গর্ভে এক-একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রতিভিৎ নামে এক পুত্র লাভ করেন, ভীমসেন

লাভ করেন সুতসোম নামে এক পুত্র, অর্জুনের পুত্র হল শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র হল শতানীক এবং সহদেবের পুত্র হল শ্রুতকর্মা।

দ্রৌপদীকে অতি সুন্দরী রমণীরূপে তাঁকে তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তীর সমতুল্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর জন্মের সময় দৈববাণী হয় যে, তাঁর নাম হবে কৃষ্ণা। সেই দৈববাণীতে আরও ঘোষিত হয় যে, বহু ক্ষত্রিয় সংহার করার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। শঙ্করের আশীর্বাদে তিনি সমযোগ্যতাসম্পন্ন পাঁচজন পতি লাভ করেছিলেন। তিনি যখন নিজ পতি মনোনয়ন করতে চান, তখন তাঁর স্বয়ংবর সভায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজা এবং রাজপুত্রদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পাণ্ডবদের বনবাসকালে তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁরা যখন তাঁদের রাজ্যে ফিরে যান, তখন মহারাজ দ্রুপদ তাঁদের যৌতুকস্বরূপ প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সমস্ত পুত্রবধূরা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে হারায়, তখন তাঁকে বলপূর্বক সভায় টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেখানে ভীষ্ম আর দ্রোণের মতো প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও, তাঁর নগ্ন সৌন্দর্য দর্শনের জন্য দুঃশাসন চেষ্টা করেছিল।

দ্রৌপদী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত এবং তাঁর প্রার্থনায় ভগবান স্বয়ং এক অন্তহীন বসনে পরিণত হয়ে তাঁকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন। জটাসুর নামে এক অসুর তাঁকে অপহরণ করেছিল, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডব স্বামী ভীমসেন সেই অসুরকে সংহার করে তাঁকে রক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেন। পাণ্ডবরা যখন বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, তখন কীচক তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ভীমসেনের হাতে সেই শয়তানেরও মৃত্যু হয় আর তিনি রক্ষা পান। অশ্বত্থামা যখন তাঁর পঞ্চপুত্রকে হত্যা করে, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। অবশেষে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময় তিনিও তাঁর স্বামী যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং পথে তিনি দেহ-ত্যাগ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর দেহত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন স্বর্গলোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন যে, দ্রৌপদী সেখানে লক্ষ্মীদেবী রূপে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন।

সুভদ্রা ঃ বসুদেবের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। তিনি কেবল বসুদেবেরই প্রিয় কন্যা ছিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামেরও অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী ছিলেন। পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরে তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে অধিষ্ঠিতা

আছেন। সেই মন্দিরে আজও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাঁদের দর্শন করতে যান। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং পরে বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে তাঁর মিলনের স্মৃতি বহন করছে এই মন্দিরটি। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারানীর মিলন এক অতি করুণ কাহিনী, এবং শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে থাকতেন।

দ্বারকায় অবস্থানকালে অর্জুন সুভদ্রাকে মহিষীরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁর সেই বাসনা তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলদেব অন্যত্র সুভদ্রার বিবাহের আয়োজন করছিলেন। বলদেবের সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করার জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দেন। তাই তাঁরা যখন রৈবত পর্বতে এক প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে সুভদ্রাকে হরণ করেন। শ্রীবলদেব অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুনকে ক্ষমা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে অনুনয় করেন। তখন যথাযথভাবে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হয় এবং অভিমন্যু সুভদ্রার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। অভিমন্যুর অকাল মৃত্যুতে সুভদ্রা অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু পরীক্ষিতের জন্ম হলে তিনি খুশি হন এবং সান্ত্বনা লাভ করেন।

শ্লোক ৫

প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্ ।
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ ॥ ৫ ॥

প্রতি—অভিমুখে; **উজ্জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **প্রহর্ষেণ**—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; **প্রাণম্**—জীবন; **তন্ব**—দেহের; **ইব**—মতো; **আগতম্**—ফিরে এসেছিলেন; **অভিসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বিধিবৎ**—বিধি-অনুসারে; **পরিষ্বঙ্গ**—আলিঙ্গন করে; **অভিবাদনৈঃ**—অভিবাদনের দ্বারা।

অনুবাদ

যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানন্দে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিবৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চেতনার অভাবে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু যখন চেতনা ফিরে আসে, তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমগ্র অস্তিত্ব তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কৌরব পরিবারের সকলের কাছে বিদুর এতই প্রিয় ছিলেন যে, রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে তাঁরা নিষ্ক্রিয়ের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই গভীরভাবে বিদুরের বিরহ অনুভব করছিলেন, এবং তাই রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রত্যাগমন সকলকেই উৎফুল্ল করে তুলেছিল।

শ্লোক ৬

মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ ।
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

মুমুচুঃ—উদ্ভূত হয়েছিল; **প্রেম**—অনুরাগ; **বাষ্প-ওঘম্**—অশ্রু; **বিরহ**—বিচ্ছেদ; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠা; **কাতরাঃ**—মর্মাহত হয়ে; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তম্**—তাকে (বিদুরকে); **অর্হয়াম্ চক্রে**—নিবেদন করেছিলেন; **কৃত**—করেছিলেন; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহম্**—আয়োজন।

অনুবাদ

উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে স্নেহের বশে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন।

শ্লোক ৭

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে ।
প্রশ্রায়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে (বিদুরকে); **ভুক্তবন্তম্**—তাঁকে বিপুলভাবে ভোজন করিয়ে; **বিশ্রান্তম্**—বিশ্রামান্তে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **সুখম্ আসনে**—আরামদায়ক আসনে; **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—স্বভাবত অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **প্রাহ**—বলতে লাগলেন; **তেষাং চ**—এবং তাঁরা; **শৃণ্বতাম্**—শুনতে লাগলেন।

অনুবাদ

বিপুলভাবে ভোজনান্তে বিশ্রাম করে বিদুর আরামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে তা শুনতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির অভ্যর্থনাতেও দক্ষ ছিলেন, এমন কি তাঁর পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রেও। পরিবারের সকলেই বিদুরকে প্রণতি নিবেদন করে এবং আলিঙ্গন করে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তার পরে, স্নান এবং ভূরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তারপর তাঁর যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিশ্রামান্তে তাঁকে আরামদায়ক আসনে বসতে দেওয়া হল এবং তখন মহারাজ পারিবারিক এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। প্রিয়বন্ধু, এমন কি শত্রুকেও অভ্যর্থনা জানাবার এটাই হল যথার্থ রীতি। ভারতীয় নীতিগত প্রথায় শত্রুও যদি গৃহে আসে, তাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত যে, তার মনে যেন কোন রকম উৎকণ্ঠা বা ভয় না থাকে। শত্রু সর্বদাই তার শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, কিন্তু শত্রুকে যদি শত্রু তার গৃহে অভ্যর্থনা জানায়, তা হলে তখন আর সেই ভাব তার থাকে না। অর্থাৎ কেউ যখন গৃহে আসে, তখন তার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো আচরণ করা উচিত। সুতরাং পরিবারের সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বিদুরের মতো আত্মীয়ের সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলা যেতে পারে!

এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

অপি স্মরথ নো যুষ্মৎ পক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্ ।
বিপদ্‌গণদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **অপি**—যদি; **স্মরথ**—আপনার মনে থাকে; **নঃ**—আমাদের; **যুষ্মৎ**—আপনার কাছ থেকে; **পক্ষ**—পাখির ডানার মতো আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব; **ছায়া**—আশ্রয়; **সমেধিতান্**—আপনি আমাদের পালন

করেছিলেন; **বিপৎ-গণাৎ**—বিবিধ প্রকার বিপদ থেকে; **বিষ**—বিষ প্রয়োগে; **অগ্নি-আদেঃ**—অগ্নি সংযোগ; **মোচিতাঃ**—মুক্ত করেছিলেন; **যৎ**—আপনি যা করেছিলেন; **স**—সহ; **মাতৃকাঃ**—আমাদের মাতা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন ঃ হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিভাবে আপনি আমাদের জননী সহ সকলকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে নিরন্তর রক্ষা করেছিলেন? পাখির ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপ ছায়া বিষ প্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।

তাৎপর্য

পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর নাবালক পুত্রগণ এবং বিধবা পত্নী পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের, বিশেষ করে ভীষ্মদেব এবং মহাত্মা বিদুরের, বিশেষ যত্নের পাত্র হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের রাজনৈতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদুর তাদের প্রতি অল্পবিস্তর পক্ষপাতিত্ব করতেন। ধৃতরাষ্ট্র যদিও মহারাজ পাণ্ডুর নাবালক পুত্রদের প্রতি সমভাবে যত্নশীল ছিলেন, তবুও পাণ্ডবদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিজপুত্রদের রাজ্যের শাসকরূপে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগে লিপ্ত ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্যতম। মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এই চক্রান্ত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এবং তাই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত সেবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্রদের স্বার্থে পরিকল্পিত তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা পছন্দ করেননি। তাই তিনি পাণ্ডবদের এবং তাদের বিধবা মাতাকে রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হয়েছিলেন।

সেই সূত্রে বলতে গেলে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের চেয়ে তিনি পাণ্ডবদেরই পক্ষপাতিত্ব করতেন, যদিও তাঁর সাধারণ দৃষ্টিতে তারা উভয়েই ছিল সমানভাবে স্নেহের পাত্র। তিনি উভয় পক্ষের ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতিই সমানভাবে স্নেহশীল ছিলেন, যেহেতু তিনি দুর্যোধনকে তার জ্ঞাতি ভ্রাতাদের প্রতি চক্রান্ত করার জন্য সব সময় তিরস্কার করতেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের উৎসাহ প্রদান করতেন বলে বিদুর সর্বদাই, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সমালোচনা করতেন, এবং সেই সঙ্গে পাণ্ডবদেরও বিশেষভাবে রক্ষা করার জন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন। রাজপ্রাসাদের রাজনীতির মধ্যে বিদুরের এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তাঁকে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতমূলক

দীর্ঘকাল তীর্থপর্যটনের উদ্দেশ্যে বিদুরের গৃহত্যাগ করার পূর্বের ইতিহাস মহারাজ যুধিষ্ঠির এখানে উল্লেখ করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক বিপুল পারিবারিক বিপর্যয়ের পরেও তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি তিনি তেমনি করুণাময় এবং স্নেহপরায়ণ হয়েই ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে, ধৃতরাষ্ট্র পরিকল্পনা করেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিনষ্ট করবেন, তাই তিনি পুরোচনকে আদেশ দিয়েছিলেন বারণাবতে একটি গৃহ নির্মাণ করতে, এবং যখন সেই গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল, তখন ধৃতরাষ্ট্র অভিলাষ করেন যে, তাঁর ভ্রাতার পরিবারবর্গ সেখানে কিছুদিন থাকবে। যখন পাণ্ডবেরা রাজপরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতিতে সেখানে যাত্রা করছিলেন, তখন বিদুর কৌশলে ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে পাণ্ডবদের পরামর্শ দিয়ে দেন।

এই ঘটনা *মহাভারতে (আদি পর্ব ১১৪)* বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরোক্ষভাবে তাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'ইস্পাত বা অন্য কোন জড় উপাদানে তৈরি না হলেও কোন কোন অস্ত্র শত্রু সংহারে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হতে পারে, এবং এ কথা যে জানে, তার কখনও মৃত্যু হয় না।' অর্থাৎ এইভাবে তিনি পাণ্ডবদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের বারণাবতে পাঠান হচ্ছে তাঁদের বধ করবার জন্য, এবং যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের নতুন প্রাসাদভবনে খুব সাবধানে থাকেন। আগুনের ইঙ্গিত দিয়েও তিনি বলেছিলেন যে, আগুন আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু জড় দেহকে সংহার করতে পারে। কিন্তু যিনি আত্মাকে রক্ষা করতে পারেন, তিনিই জীবিত থাকেন।

যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে বিদুরের যেভাবে পরোক্ষ আলোচনা হচ্ছিল, তা কুন্তী বুঝতে পারেননি, এবং তাই তিনি যখন তাঁর পুত্রকে সেই আলোচনার তাৎপর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিদুরের কথা থেকে বোঝা গেল যে, তাঁরা যে গৃহে বাস করতে যাচ্ছেন, সেখানে আগুনের সম্ভাবনা রয়েছে।

পরে, বিদুর গোপনে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রে গৃহরক্ষী সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে চলেছে। এটাই ছিল ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্ত, যাতে পাণ্ডবেরা একসঙ্গে তাঁদের মায়ের সাথে মারা যেতে পারে।

তবে, বিদুরের সতর্কতায় পাণ্ডবেরা মাটির তলায় এক সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের অভিপ্রস্থান

সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি, এবং অগ্নি সংযোগের পরে, কৌরবেরা পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিত হয়েছিল যে, ধৃতরাষ্ট্র মহা উল্লাসে মৃত্যুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। আর, শোকপালন পর্বে প্রাসাদের সমস্ত লোক শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিদুর তা হননি, তাঁর জানা ছিল যে, পাণ্ডবরা অন্যত্র জীবিতই রয়েছেন।

এই রকম বহু দুর্বিপাকের ঘটনা আছে, এবং প্রত্যেকটিতেই বিদুর একদিকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন, আর অন্যদিকে তিনি তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে এই ধরনের চক্রান্ত করা থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই, পাখি যেমন তার পক্ষছায়ার দ্বারা তার ডিমগুলিকে আগলে রাখে, বিদুর ঠিক তেমন-ভাবেই সর্বদা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ হয়েই ছিলেন।

শ্লোক ৯

কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৯ ॥

কয়া—কিসের দ্বারা; **বৃত্ত্যা**—উপায়; **বর্তিতম্**—দেহ ধারণ; **বঃ**—আপনি; **চরদ্ভিঃ**—ভ্রমণকালে; **ক্ষিতিমণ্ডলম্**—পৃথিবীমণ্ডলে; **তীর্থানি**—তীর্থস্থানে; **ক্ষেত্র-মুখ্যানি**—প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রে; **সেবিতানি**—আপনি সেবা করেছেন; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ভূতলে**—এই ভূমণ্ডলে।

অনুবাদ

আপনি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণকালে কোন্ বৃত্তির দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করতেন? কোন্ কোন্ প্রধান পবিত্রধাম এবং তীর্থের সেবা আপনি করেছেন?

তাৎপর্য

পারিবারিক বিষয়াদি থেকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক জটিলতা থেকে নিজেকে নিরাসক্ত করার উদ্দেশ্যে বিদুর প্রাসাদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, দুর্যোধন তাঁকে শূদ্রাণীর পুত্র বলায় তিনি যথার্থই অপমানিত হয়েছিলেন, অবশ্য নিজের মাতামহী সম্পর্কে লঘুভাবে মন্তব্য করা আচারবিরোধী নয়। বিদুরের মাতা শূদ্রাণী হলেও দুর্যোধনের মাতামহী ছিলেন, এবং পৌত্র ও মাতামহীর মধ্যে কখনো কখনো পরিহাসাত্মক বাক্যালাপ স্বীকৃত হয়েই থাকে। কিন্তু যেহেতু ঐ

মন্তব্যটি ছিল বাস্তব সত্য, তাই সেই কথাটি বিদুরের কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়েছিল, এবং সেটিকে প্রত্যক্ষ অপমান বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে সংসার ত্যাগের জীবন-যাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এই প্রস্তুতি পর্বকে বলা হয় বানপ্রস্থ আশ্রম অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে পৃথিবীর পবিত্রধামগুলিতে পরিভ্রমণ ও দর্শন করে বেড়ানো। বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জগন্নাথপুরী এবং প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের পবিত্র ধামগুলিতে বহু মহান্ ভক্ত থাকেন, এবং এখনও সেখানে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক মানুষদের সুবিধার জন্য বিনামূল্যের অন্নসত্র আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির জানতে চেয়েছিলেন, বিনামূল্যের অন্নসত্রে কৃপালাভ করে বিদুর দেহযাত্রা নির্বাহ করেছিলেন কিনা।

শ্লোক ১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১০ ॥

ভবৎ—আপনার; **বিধাঃ**—মতো; **ভাগবতাঃ**—ভগবদ্ভক্তেরা; **তীর্থ**—পবিত্র তীর্থস্থানাদি; **ভূতাঃ**—পরিণত করা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিভো**—হে শক্তিমান; **তীর্থী-কুর্বন্তি**—পবিত্র তীর্থধামে পরিণত করতে পারেন; **তীর্থানি**—পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে; **স্ব-অন্তঃ-স্থেন**—নিজের অন্তরে স্থিত; **গদাভৃতা**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার মতো মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন।

তাৎপর্য

পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর বহুবিধ শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি মহাশূন্যে সর্বব্যাপ্ত। তেমনই, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায় এবং প্রকটিত হয়ে থাকে বিদুরের মতো তাঁর অমলিন শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর সাহায্যেই, ঠিক যেমন বিজলীবাতির মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি প্রকটিত হয়। বিদুরের মতো শুদ্ধভক্ত সর্বদাই পরমেশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করে থাকেন। তিনি পরমেশ্বরের শক্তির মধ্যে সব কিছুই দেখতে পান এবং সব কিছুর মাঝেও

পরমেশ্বরকেই দেখেন। পরমেশ্বরের অকৃত্রিম শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত এক পরিবেশে মানুষের কলুষিত চেতনাকে নির্মল করে তোলার উদ্দেশ্যেই সারা পৃথিবীতে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি রয়েছে।

যদি কেউ পবিত্র তীর্থধামে যান, তিনি অবশ্যই সেই পবিত্রধামে বসবাসকারী শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর অন্বেষণ করবেন, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন, সেই উপদেশগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন, এবং সেইভাবে ক্রমশই চরম মোক্ষলাভের জন্য, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকবেন।

কোনও পবিত্র তীর্থস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করা বা ঐসব জায়গায় অবস্থিত মন্দিরাদি দর্শন করা নয়। সেখানে বিদুরের প্রতিভূদেরও অন্বেষণ করতে হয়, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা ছাড়া আর কোন কিছুই বাসনা করেন না। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবান সর্বদাই অবস্থান করেন, কারণ তাঁদের অকৃত্রিম সেবার মধ্যে ফলাশ্রয়ী সকাম কাজকর্ম বা আকাশকুসুম জল্পনা-কল্পনার লেশমাত্র থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরমেশ্বরের প্রকৃত সেবায়, বিশেষ করে শ্রবণ এবং কীর্তনাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়েই থাকেন। শুদ্ধ ভক্তেরা প্রামাণ্য সূত্র থেকে পরমেশ্বরের মহিমা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ভজন করেন এবং নিবন্ধাদি রচনাও করেন।

মহামুনি ব্যাসদেব নারদ মুনির কাছে শ্রবণ করেছিলেন এবং তারপরে লিপি-রচনার মাধ্যমে তা কীর্তন করেছিলেন; শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনি পরীক্ষিতের কাছে তা বর্ণনা করেন; এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের পন্থা।

সুতরাং পরমেশ্বরের শুদ্ধভক্তমণ্ডলী তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা যে কোন স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করতে পারেন, এবং তাঁদেরই জন্য পবিত্রধামগুলি তীর্থনামে যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী যে কোনও স্থানের কলুষময় পরিবেশ পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম, এবং পবিত্র ধামের সুনাম নষ্ট করে যারা পেশাদারী জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করে থাকে, সেই সমস্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকেদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের দ্বারা কোনও পবিত্র ধাম অপবিত্র হয়ে গেলেও এই শুদ্ধভক্তগণই যে আবার তা পবিত্র করেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

শ্লোক ১১

অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্যাং সুখমাসতে ॥

অপি—কি না; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃদঃ**—সুহৃদবর্গ; **তাত**—হে পিতৃব্য; **বান্ধবাঃ**—বন্ধু-বান্ধব; **কৃষ্ণ-দেবতা**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা সর্বদা নিমগ্ন; **দৃষ্টাঃ**—তাঁদের দেখে; **শ্রুতাঃ**—অথবা তাঁদের কথা শুনে; **বা**—অথবা; **যদবঃ**—যদু বংশীয়; **স্ব-পুর্যাম্**—তাঁদের বাসস্থানে; **সুখম্ আসতে**—সুখে আছে কি না।

অনুবাদ

হে পিতৃব্য, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং সুহৃদবর্গ যাদবেরা রয়েছেন, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন বা তাঁদের কথা শুনে থাকবেন। তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব স্ব গৃহে সুখে আছেন তো?

তাৎপর্য

বিশেষ শব্দ *'কৃষ্ণদেবতা'* , অর্থাৎ, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন রয়েছেন, কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। যাদবেরা এবং পাণ্ডবেরা, যাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় এবং তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত কার্যকলাপ স্মরণে মগ্ন থাকতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদুরের মতো পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত। বিদুর গৃহত্যাগ করেছিলেন পরমেশ্বরের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য, কিন্তু পাণ্ডবেরা এবং যাদবেরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাই তাদের শুদ্ধ ভক্তি বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য ছিল না। গৃহেই থাকুন অথবা গৃহত্যাগ করুণ, শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃত গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, অর্থাৎ, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে যথার্থভাবে অবগত থাকেন।

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং তাদের মতো অন্যান্য অসুরেরাও সর্বক্ষণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকত, কিন্তু তাদের সেই মগ্নতা ছিল অন্য রকমের, অর্থাৎ তারা প্রতিকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, অথবা, তাঁকে শুধুমাত্রই একজন শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে করত। সুতরাং, বিদুর, পাণ্ডবগণ এবং যাদবদের মতো শুদ্ধ ভক্তের সমস্তরের ভক্তি চর্চার পর্যায়ে কংস আর শিশুপাল ছিল না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বারকায় তাঁর পার্ষদদের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তা না হলে তিনি বিদুরকে তাঁদের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজ্য শাসনের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ জাগতিক কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, বিদুরেরই মতো সমস্তরের ভক্তিচর্চার পর্যায়ে অবস্থান করতেন।

শ্লোক ১২

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন সর্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ ।
যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ধর্মরাজেন**—যুধিষ্ঠির মহারাজের দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তা; **সমবর্ণয়ৎ**—যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিলেন; **যথা-অনুভূতম্**—তাঁর অভিজ্ঞতা অনুসারে; **ক্রমশঃ**—একে একে; **বিনা**—ব্যতীত; **যদু-কুল-ক্ষয়ম্**—যদুবংশের বিনাশ।

অনুবাদ

এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলে, মহাত্মা বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৩

নন্বপ্রিয়ং দুর্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্ ।
নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥

ননু—প্রকৃতপক্ষে; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **দুর্বিষহম্**—অসহনীয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **স্বয়ম্**—আপনা থেকে; **উপস্থিতম্**—উপস্থিত; **ন**—না; **আবেদয়ৎ**—বলা উচিত; **স-করুণো**—করুণাময়; **দুঃখিতান্**—দুঃখিতদের; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; **অক্ষমঃ**—অক্ষম।

অনুবাদ

করুণাময় মহাত্মা বিদুর কোন সময়ই পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে পারতেন না। তাই তিনি অপ্রিয় আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ দুর্যোগাদি আপনা হতেই আসে।

তাৎপর্য

নীতি শাস্ত্র অনুসারে, অন্যের দুঃখ হতে পারে এমন অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই দুঃখ-দুর্দশা আমাদের ওপরে নেমে আসে, সুতরাং তা নিয়ে প্রচার করে তার তীব্রতা বৃদ্ধি করা কারও উচিত নয়। বিদুরের মতো কোমলাত্মা ব্যক্তির পক্ষে, বিশেষ করে তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের কাছে, যদুকুল ধ্বংসের মতো দুর্বিষহ সংবাদ বিষয়টি শোনানো অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ইচ্ছা করেই নিরস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো দেববৎ সুখম্ ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্বেষাং সুখমাবহন্ ॥ ১৪ ॥

কালম্—সময়; **অথ**—এইভাবে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **সৎ-কৃতঃ**—অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে; **দেব-বৎ**—দেবতাদের মতো; **সুখম্**—সুখে; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **জ্যেষ্ঠস্য**—জ্যেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ-কৃৎ**—তাঁর মঙ্গল বিধানের জন্য; **সর্বেষাম্**—অন্য সকলের; **সুখম্**—সুখে; **আবহন্**—সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

এই মহাত্মা বিদুর তাঁর জ্ঞাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবতুল্য মানুষের মতোই সমাদৃত হয়ে কিছুদিন সেখানে রইলেন যাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির মঙ্গলসাধন করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।

তাৎপর্য

বিদুরের মতো ঋষিতুল্য মানুষদের স্বর্গ থেকে আগত দেবতাদের মতোই সমাদর করতে হয়। তখনকার দিনে স্বর্গলোকের দেবতারা যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো মানুষদের গৃহে আসতেন, এবং কখনও কখনও অর্জুনের মতো ব্যক্তিরা উচ্চতর গ্রহলোকে যেতেন। নারদমুনি হলেন এক মহাকাশচারী যিনি অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, কেবল এই জড় ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীতেও। এমন কি নারদমুনি পর্যন্ত যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রাসাদ পরিদর্শন করতে আসতেন, আর তা হলে স্বর্গলোকের অন্যান্য দেবদেবীদের কথা আর কীই বা বলা যায়?

শুধুমাত্র পারমার্থিক চর্চার ফলেই মানুষ সশরীরে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করতে পারেন। তাই দেবদেবীদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানান হয়, সেইভাবেই মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরের অভ্যর্থনা করেছিলেন।

মহাত্মা বিদুর ইতিপূর্বেই সংসার ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাই তিনি খানিক জড়সুখ ভোগ করার জন্য তাঁর পৈতৃক প্রাসাদভবনে প্রত্যাবর্তন করেননি। কৃপাপরবশ হয়েই তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্ধার করা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সমগ্র রাজ্য এবং বংশধরদের হারিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও, অসহায় হয়ে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দয়াদাক্ষিণ্য এবং আতিথেয়তা গ্রহণ করতে তিনি লজ্জিতবোধ করেননি। যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে তাঁর পিতৃব্যের প্রতিপালন করা যথাযথই হয়েছিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের উদার আতিথেয়তা গ্রহণ করা মোটেই উচিত হয়নি। তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বিদুর বিশেষত এসেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বজ্ঞান দান করে পরমার্থের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য। যাঁরা তত্ত্ব-দ্রষ্টা, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করা, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিদুর এসেছিলেন। তবে পারমার্থিক তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনা এতই মনোরম যে, বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন পরিবারের অন্য সকলেও ধৈর্য্য সহকারে তাঁর কথা শুনেছিলেন। এটিই পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা। একাগ্রচিত্তে সেই বাণী শ্রবণ করতে হয়, এবং তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষ যখন সেই কথা বলেন, তখন তা বদ্ধ জীবের সুপ্ত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করে। নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, মানুষ আত্ম-উপলব্ধির শুদ্ধ স্তরে উপনীত হতে পারে।

শ্লোক ১৫

অবিভ্রদর্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু ।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ ॥ ১৫ ॥

অবিভ্রৎ—ধারণ করেছিলেন; **অর্যমা**—অর্যমা; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **যথাবৎ**—যথোপযুক্তভাবে; **অঘ-কারিষু**—পাপীদের; **যাবৎ**—যতদিন পর্যন্ত ; **দধার**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শূদ্রত্বম্**—শূদ্রত্ব; **শাপাৎ**—শাপের ফলে; **বর্ষ-শতম্**—একশ বছর; **যমঃ**—যমরাজ।

অনুবাদ

মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিদুর যতদিন শূদ্রত্ব ধারণ করে ছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অর্যমা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ দণ্ড বিধানের জন্য যমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম হওয়ার ফলে, বিদুর তাঁর ভাই ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর সাথে রাজবংশানুক্রমের অংশীদার হওয়া থেকেও প্রত্যাখ্যাত হন। তা হলে তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজা যুধিষ্ঠিরের মতো অমন জ্ঞানবান নৃপতি এবং ক্ষত্রিয়দের তত্ত্বকথা উপদেশ দেবার পদ অধিকার করলেন কিভাবে?

তার প্রথম উত্তর হচ্ছে যে, জন্মগতভাবে তিনি একজন শূদ্র, তা স্বীকার করলেও, যেহেতু তিনি মৈত্রেয় ঋষির প্রামাণ্য-সূত্রে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পদে আদ্যোপান্তভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তিনি আচার্য অর্থাৎ পারমার্থিক শিক্ষাগুরুর পদমর্যাদা অধিকারের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে ওঠেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ঃ

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥'

'ব্রাহ্মণ, কিংবা শূদ্র, গৃহস্থ কিংবা সন্ন্যাসী, যিনিই হন, তিনি যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তিনি আচার্য বা গুরু হওয়ার যোগ্য।' এমন কি সাধারণ নীতি শাস্ত্রাদিতেও (যা মহান্ রাজনীতিবিদ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্য পণ্ডিত সমর্থন করে গেছেন) বলা হয়েছে যে, কেউ শূদ্রেরও অধম জাতিকুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হয় না। এই হল উত্তরের একটি অংশ।

উত্তরের অন্য অংশটি এই যে, বিদুর প্রকৃতপক্ষে শূদ্র ছিলেন না। মণ্ডূক মুনির অভিশাপে তাঁকে একশত বছর তথাকথিত শূদ্রত্ব ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যমরাজের অবতার। সেই সূত্রে তাঁর মর্যাদা ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ প্রমুখ মহাজনদের সমপর্যায়েই অবস্থিত। এক মহাজন বলেই যমরাজের কর্তব্য হল ঃ নারদ, ব্রহ্মা আদি অন্যান্য মহাজনদের মতো ভগবদ্ভক্তির বাণী পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে প্রচার করা।

কিন্তু যমরাজ সর্বক্ষণ তাঁর অগ্নিগর্ভ যমলোকে পাপীদের দণ্ডবিধানের কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই পৃথিবী থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে এক বিশেষ গ্রহে মৃত্যুর পরে পাপজর্জরিত জীবাত্মাদের নিয়ে গিয়ে, তাদের নিজ নিজ পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডবিধান করার দায়িত্বভার যমরাজের ওপর পরমেশ্বর ন্যস্ত করেছেন। তাই অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার থেকে যমরাজের অবসর গ্রহণের সামান্যই অবকাশ হয়। সদাচারী মানুষদের চেয়ে দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যাই বেশি। তাই পরমেশ্বর ভগবানেরই কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত প্রতিনিধিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের চেয়ে অধিক কাজ করতে হয়। কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তিনি মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান ভক্তের মতো কঠিন কাজ করেছিলেন।

এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত শূদ্রও নন বা ব্রাহ্মণও নন। তিনি এই জড়জাগতিক সমাজ ব্যবস্থায় ঐ ধরনের বর্ণ বিভাগের অনেক অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান শূকর রূপে অবতারত্ব গ্রহণ করলেও তিনি শূকর নন, অথবা ব্রহ্মাও নন। তিনি সমস্ত জড়জাগতিক প্রাণীদেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর এবং তাঁর বিভিন্ন প্রামাণ্য ভক্তদের কখনও কখনও বহু নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু পরমেশ্বর এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই চিন্ময় মর্যাদার স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।

যমরাজ যখন সেই মতো বিদুর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন কশ্যপ এবং অদিতির বহু পুত্রের অন্যতম পুত্র অর্যমা তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আদিত্যরা হচ্ছেন অদিতির পুত্র, এবং দ্বাদশজন আদিত্য আছেন। অর্যমা হচ্ছেন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম, এবং তাই বিদুর রূপে যমরাজ যখন একশত বছর অনুপস্থিত ছিলেন, তখন অর্যমার পক্ষে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করা খুবই সম্ভব ছিল। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, বিদুর কখনই শূদ্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশুদ্ধতম শ্রেণীর ব্রাহ্মণের চেয়েও মহত্তর।

শ্লোক ১৬

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্ ।
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—যুধিষ্ঠির; **লব্ধ-রাজ্যঃ**—তাঁর পিতৃরাজ্য লাভ করে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **পৌত্রম্**—পৌত্র; **কুলম্-ধরম্**—উপযুক্ত বংশধর; **ভ্রাতৃভিঃ**—ভায়েদের সঙ্গে; **লোক-পালাভৈঃ**—যাঁরা সকলেই ছিলেন দক্ষ প্রশাসক বা লোকপালের মতো; **মুমুদে**—জীবন উপভোগ করেছিলেন; **পরয়া**—অসাধারণ; **শ্রিয়াঃ**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

মহারাজা যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য জয় করে এবং তাঁর বংশের মহান্ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপযুক্ত এক পৌত্রের জন্মের দর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই দক্ষ প্রশাসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শুরু থেকেই মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন উভয়েই বিমর্ষ হয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধে হত্যা করতে তাঁরা অনিচ্ছুক হলেও, কর্তব্য রূপেই তাঁদের তা করতে হয়েছিল, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম অভিলাষ মতোই তা পরিকল্পিত হয়েছিল। যুদ্ধের পরে, ঐ ধরনের গণহত্যার কথা ভেবে যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের পরে কুরুবংশের ধারা অব্যাহত রাখার মতো আর কেউ ছিল না। একমাত্র শেষ আশা ছিল তাঁদের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভস্থ শিশু এবং তাঁকেও অশ্বত্থামা আক্রমণ করেছিল, তবে পরমেশ্বরের কৃপায় শিশুটি রক্ষা পেয়েছিল।

তাই বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্তে আনার পর এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার পর, এবং জীবিত সন্তান পরীক্ষিতকে দেখার পরে, যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মানব-সত্তা কিছুটা স্বস্তি বোধ করে, যদিও জড়জাগতিক সুখ যা নিয়তই মায়াময় এবং অনিত্য অস্থায়ী, তার প্রতি তাঁর লেশমাত্র আসক্তিও ছিল না।

শ্লোক ১৭

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া ।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **গৃহেষু**—পারিবারিক বিষয়ে; **সক্তানাম্**—যারা অত্যন্ত আসক্ত; **প্রমত্তানাম্**—উন্মাদের মতো আসক্ত; **তৎ-ঈহয়া**—সেই প্রকার চিন্তায় মগ্ন; **অত্যক্রামৎ**—অতিক্রম করেছিল; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাতসারে; **কালঃ**—অনন্তকাল; **পরম**—পরম; **দুস্তরঃ**—অনতিক্রমণীয়।

অনুবাদ

যাঁরা গৃহ-পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।

তাৎপর্য

'আমি এখন সুখী; আমার সব কিছুই ঠিকভাবে চলছে; ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা; আমার সন্তান-সন্ততিদের আমি এখন অনেক সম্পত্তি দিতে পারি; আমি এখন সফল হয়েছি; গরিব ভিখারি সন্ন্যাসীরা ভগবানের ওপর ভরসা করে, কিন্তু তারা আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসে; অতএব আমি পরমেশ্বর ভগবানের চেয়েও বড়।' বহমান অনন্ত কালের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে যে বিকারগ্রস্ত আসক্ত গৃহস্থ, তাকে যেসব চিন্তাভাবনা আবিষ্ট করে রাখে, এগুলি তারই মধ্যে কয়েকটি।

আমাদের আয়ুষ্কাল পরিমিত, এবং বিধির বিধানের অতিরিক্ত একটি পলকও তাতে কেউ বাড়াতে পারে না। বিশেষ করে, মানব সত্তার পক্ষে এমন অমূল্য সময়ের সতর্ক ব্যবহার করা উচিত, কারণ একটি পলকও যদি অজ্ঞাতসারে বয়ে যায়, তা হলে অতি কষ্টে অর্জিত হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা আবার পূরণ করা যাবে না।

মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের চরম সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়েছে, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম এবং মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করার জন্যই এই জীবন। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দ্বারা প্রভাবিত জড় দেহটাই জীবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। তা না হলে, জীব নিত্য; তার জন্ম নেই, তার কখনও মৃত্যু নেই। মূর্খ লোকেরা এই সমস্যার কথা ভুলে যায়। জীবনের এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, তারা তা আদপেই জানে না, কিন্তু তারা অনিত্য সংসার-পরিবার বিষয়ে মগ্ন হয়ে থাকে, আর তারা জানে না যে, অজ্ঞাতসারে অনন্তকাল এগিয়ে চলেছে এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের পরিমিত আয়ুষ্কাল হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, জন্ম এবং মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বিপুল সমস্যার কোনও সমাধানই করা হচ্ছে না। একেই বলা হয় মায়া।

কিন্তু পরমেশ্বরের ভক্তি-সেবা চর্চায় যিনি সদা জাগ্রত, মায়া তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং তাঁর ভাই পাণ্ডবেরা সকলেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং এই জড়জাগতিক মায়াময় সুখের প্রতি তাঁদের লেশমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বদাই মুক্তিদাতা পরমেশ্বর মুকুন্দের সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং তাই স্বর্গ সুখের প্রতিও তাঁর কোনরকম আকর্ষণ ছিল না, কারণ ব্রহ্মলোকের সুখও অনিত্য এবং মায়াময়। জীব যেহেতু নিত্য, তাই সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যধাম পরব্যোমেই কেবল সুখী হতে পারে, যেখানে একবার গেলে আর এই জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধির রাজ্যে কাউকে ফিরে আসতে হয় না।

সুতরাং নিত্য, শাশ্বত জীবের পক্ষে জড় জগতের যে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা নিত্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয় না, তা সম্পূর্ণ মায়াময়। তত্ত্বগতভাবে যিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, এবং এই ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম সুখ বা পরম আনন্দ লাভ করার জন্য যে কোন জড় সুখ পরিত্যাগ করতে পারেন। প্রকৃত পরমার্থবাদীরা এই আনন্দ আস্বাদনের জন্য বুভুক্ষু হয়ে থাকেন এবং বুভুক্ষু মানুষ খাদ্য ছাড়া জীবনের আর কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারে না, তেমনই যিনি নিত্য শাশ্বত আনন্দের জন্য বুভুক্ষু হয়ে আছেন, তিনি কখনই কোন প্রকার জড় সুখের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারেন না। তাই, এই শ্লোকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা মহারাজা যুধিষ্ঠির অথবা তাঁর ভ্রাতা বা মাতার প্রতি প্রযোজ্য নয়। ধৃতরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির পক্ষেই এগুলি প্রযোজ্য, কারণ তাঁকে উপদেশ দানের জন্যই বিদুর বিশেষভাবে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৮

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥ ১৮ ॥

বিদুরঃ—মহাত্মা বিদুর; **তৎ**—তা; **অভিপ্রেত্য**—ভালভাবে জেনে; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্রকে; **অভাষত**—বলেছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **নির্গম্যতাম্**—দয়া করে এখনি বেরিয়ে পড়ুন; **শীঘ্রম্**—কোন বিলম্ব না করে; **পশ্য**—দেখুন; **ইদম্**—এই; **ভয়ম্**—ভয়; **আগতম্**—সমাগত।

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে রাজন্, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আর বিলম্ব করবেন না। দেখুন, মহাভয় কিভাবে আপনাকে আচ্ছন্ন করছে।

তাৎপর্য

নিষ্ঠুর মৃত্যু কাউকেই গ্রাহ্য করে না, তা তিনি ধৃতরাষ্ট্রই হোন, অথবা যুধিষ্ঠির মহারাজই হোন; তাই, যে পারমার্থিক উপদেশ বয়োবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছিল, যুবক যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষেও তা ছিল সমভাবেই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে রাজা এবং তাঁর ভ্রাতৃ বর্গ ও মাতা সহ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকেই একাগ্র চিত্তে বিদুরের সেই উপদেশ অনুধাবন করছিলেন। তবে বিদুর জানতেন যে, তাঁর উপদেশগুলি বিশেষ করে ধৃতরাষ্ট্র, যিনি অত্যধিক জড়জাগতিক ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যেই দিচ্ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে *রাজন্* শব্দটির বিশেষ ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাই নিয়মানুযায়ী হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে তাঁরই অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ হওয়ার ফলে সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা তিনি ভুলতে পারেননি, এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর এই নৈরাশ্যের কিছুটা উপশম হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কয়েকটি নাবালক সন্তান রেখে গিয়েছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি বাস্তবিকই রাজা হতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর রাজ্য দুর্যোধনের নেতৃত্বে তাঁর পুত্রদের হস্তান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর শ্যালক শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সকল প্রকার চক্রান্ত গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমস্তই ব্যর্থ হয়েছিল, এবং শেষ পর্বে, তাঁর লোকবল এবং ধনবল সব কিছু হারিয়েও, তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতাত রূপে রাজা হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তব্যবশে রাজকীয় সম্মানে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিপালন করেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়ার অলীক ধারণা পোষণ করে অথবা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজকীয় পিতৃব্যরূপে তাঁর জীবনের সীমিত দিনগুলি সুখে অতিবাহিত করছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মপরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর জরা ও ব্যাধিজনিত এই মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই বিদুর বক্রোক্তি করে ধৃতরাষ্ট্রকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজা ছিলেন না।

প্রত্যেকেই মহাকালের দাস, এবং তাই এই জড় জগতে কেউই রাজা হতে পারে না। রাজা মানে হচ্ছে, যে মানুষ আদেশ দিতে পারেন। এক বিখ্যাত ইংরেজ রাজা মহাকাল এবং সমুদ্রতরঙ্গকে আদেশ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মহাকাল এবং সমুদ্র তাঁর সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। তাই এই জড় জগতে মানুষ বৃথাই রাজা হয়ে থাকে, এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষত তাঁর সেই অলীক পদমর্যাদা এবং তৎকালীন বাস্তব ভয়াবহ ঘটনাদি, ইতিমধ্যেই তিনি যেগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়েছিলেন। বিদুর তাঁকে বলেছিলেন, যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি যেন তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যান।

বিদুর যুধিষ্ঠির মহারাজকে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মতো একজন নৃপতি এই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী জগতের সমস্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির বিষয়েই অবগত আছেন এবং বিদুর উপস্থিত না থাকলেও তিনি যথাকালে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো ।
স এষ ভগবান্ কালঃ সর্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥ ১৯ ॥

প্রতিক্রিয়া—প্রতিকার; **ন**—নেই; **যস্য**—যার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কুতশ্চিৎ**—কোন উপায়ে; **কর্হিচিৎ**—কারোর দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু; **সঃ**—সেই; **এষঃ**—অবশ্যই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কালঃ**—অনন্তকাল; **সর্বেষাম্**—সকলের; **নঃ**—আমাদের; **সমাগতঃ**—সমুপস্থিত।

অনুবাদ

এই জড় জগতের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কোন মহান শক্তিই মৃত্যুর নির্মম কবল প্রতিরোধ করতে পারে না। মানুষের শারীরিক দুর্দশার কারণ যতই উৎকট হোক্ না কেন, মরতে কেউই চায় না। এমন কি, জ্ঞান চর্চার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও, বার্ধক্য অথবা মৃত্যুর কোনও প্রতিকার পন্থাই নেই. নির্মম কালের হুকুমনামায় মৃত্যুর আগমন হলে তারই বিজ্ঞপ্তি হল বার্ধক্য, এবং মহাকালের হুকুমনামা কিংবা চরম বিচার গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতে কেউই পারে না।

এই কথাই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ আসন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতির কোন রকম প্রতিকার পন্থা খুঁজে বার করবার জন্য তিনি হয়ত বিদুরকে বলতে পারতেন, এবং সেই রকম আদেশ তিনি পূর্বেও বহুবার করেছিলেন। তাই আদেশ দেওয়ার পূর্বেই অবশ্য বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন যে, এই জড় জগতের কোনও ব্যক্তির দ্বারা অথবা কোনও উপায়ে তার প্রতিকার পন্থা নেই। আর যেহেতু জড় জগতে সেই রকম কোনও পন্থাই নেই, তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হলেন মৃত্যুর অভিন্ন রূপ এই কথা পরমেশ্বর স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১০/৩৪) ব্যক্ত করেছেন।

এই জড় জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তির বা কোনও উপায়ের দ্বারা মৃত্যুকে প্রতিহত করা যায় না। হিরণ্যকশিপু অমর হতে চেয়েছিল এবং এমন কঠোর তপস্যা করেছিল যাতে, সারা ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই কঠোর তপস্যা থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিরস্ত করার জন্য ব্রহ্মা নিজে তার কাছে এসেছিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন যে, তিনি নিজেও, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ-লোকে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও অমর নন, সুতরাং তিনি কিভাবে তাকে অমরত্ব লাভের বরদান করতে পারেন? তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও মৃত্যু বর্তমান, সুতরাং ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মলোকের থেকে অনেক অনেক নিকৃষ্ট অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। যেখানেই মহাকালের প্রভাব বর্তমান, সেখানেই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশদায়ক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এগুলি সবই অপরাজেয়।

শ্লোক ২০

যেন চৈবাভিপন্নোঽয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি ।
জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

যেন—কালের প্রভাবে; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **অভিপন্নঃ**—প্রভাবগ্রস্ত হয়ে, **অয়ম্**—এই; **প্রাণৈঃ**—প্রাণ থেকেও; **প্রিয়-তমৈঃ**—সব চেয়ে প্রিয়; **অপি**—যদিও; **জনঃ**—মানুষ; **সদ্যঃ**—সহসা; **বিযুজ্যেত**—বিযুক্ত হয়; **কিম্ উত অন্যৈঃ**—অন্য বিষয়ে আর কি বলার আছে; **ধন-আদিভিঃ**—ধন, সম্পদ, যশ, সন্তান-সন্ততি, গৃহ ইত্যাদি।

অনুবাদ

যে-ই মহাকালের দ্বারা প্রভাবগ্রস্ত হয়, তাকে অবশ্যই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণই সমর্পণ করতে হয়, এবং ধন-সম্পদ, মান মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জমি বাড়ি এই সবের মতো অন্যান্য জিনিসের কথা আর বলার কী আছে!

তাৎপর্য

এক বিরাট ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, যিনি পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি পরিকল্পনা কমিশনেরই এক দরকারি সভায় যোগদান করতে যাওয়ার সময়, অকস্মাৎ অপ্রতিহত অনন্ত মহাকালের আহ্বানে তাঁকে জীবন, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ, জমি বাড়ি ইত্যাদি সব কিছু সমর্পণ করে চলে যেতে হয়।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সময় এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানরূপে দেশ বিভাগ হওয়ার সময়, কত ধনী এবং প্রভাবশালী ভারতবাসীকে কালের প্রভাবে ধন, মান ও প্রাণ সমর্পণ করতে হয়েছিল এবং সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, এই রকম শতসহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যা সবই হচ্ছে কালের প্রভাবগত পরিণাম।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে, এমন কোনও শক্তিমান জীবসত্তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই। বহু কবি কালের প্রভাব নিয়ে আক্ষেপ করে কবিতা লিখেছেন। ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীতে অনেক প্রলয় ঘটে গেছে, এবং কেউ তা কোনভাবেই প্রতিহত করতে পারেনি। এমন কি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কত কিছুই আসছে আর যাচ্ছে, যার মধ্যে আমাদের কোনই হাত নেই, কিন্তু কোনও প্রতিকার পন্থা ছাড়াই সেগুলি থেকে আমাদের দুর্ভোগ পেতে হয় কিংবা সইতে হয়। সেটাই হল কালের পরিণাম।

শ্লোক ২১

পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ম্ ।
আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২১ ॥

পিতৃ—পিতা; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতা; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **হতাঃ**—মৃতেরা; **তে**—আপনার; **বিগতম্**—বিগত; **বয়ম্**—বয়স; **আত্মা**—দেহ; **চ**—ও; **জরয়া**—জরা; **গ্রস্তঃ**—গ্রস্ত; **পর-গেহম্**—অন্যের গৃহে; **উপাসসে**—আপনি বাস করছেন।

অনুবাদ

আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই মৃত এবং প্রয়াত। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার দেহ এখন জরাগ্রস্ত, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন।

তাৎপর্য

রাজাকে নিষ্ঠুর কালের প্রভাবে তাঁর শোচনীয় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বুদ্ধিমানের মতো তাঁর বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, তাঁর নিজের জীবনে কি ঘটতে চলেছে। তাঁর পিতা বিচিত্রবীর্য বহুকাল পূর্বে প্রয়াত হন, তখন তিনি এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ছিলেন ছোট্ট শিশু, এবং ভীষ্মদেবেরই স্নেহ এবং করুণার ফলে তাঁরা যথাযথভাবে বড় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তারপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুরও মৃত্যু হয়। তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর শতপুত্র এবং তাঁর সমস্ত পৌত্র, ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং অন্যান্য অনেক রাজা ও বন্ধু সহ তাঁর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁর সমস্ত লোকবল আর ধনবল বিনষ্ট হয়ে গেছে, এবং তিনি তাঁর যে সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদের নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলেন, এখন তাঁদেরই কৃপায় জীবন ধারণ করে আছেন। আর এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রত্যেককেই তার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং পরমেশ্বরের কৃপার সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হয়। ফলাফলের জন্য পরম নিয়ন্তার ওপর ভরসা রেখে, বিশ্বস্তভাবে নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হয়। পরমেশ্বর ভগবান রক্ষা না করলে কোনও বন্ধু, কোনও সন্তান-সন্ততি, কোনও পিতা, কোনও ভাই, কোনও রাষ্ট্র এবং অন্য কেউই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন, কারণ সেই আত্মরক্ষার অনুসন্ধানই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ধৃতরাষ্ট্রের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী কথাগুলির মাধ্যমে তাঁকে আরও ব্যাপকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২২

অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞাশ্চ সাম্প্রতং ।
বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফমুদ্বহন্ ॥ ২২ ॥

অন্ধঃ—অন্ধ; **পুরা**—প্রথম থেকে; **এব**—অবশ্যই; **বধিরঃ**—বধির; **মন্দ-প্রজ্ঞাঃ**—দুর্বল স্মৃতি; **চ**—এবং; **সাম্প্রতম্**—সম্প্রতি; **বিশীর্ণ**—জীর্ণ; **দন্তঃ**—দাঁত; **মন্দ-অগ্নি**—অগ্নি মান্দ্য; **সরাগঃ**—সশব্দে; **কফম্**—কফসহ কাশি; **উদ্বহন্**—বাইরে আসছে।

অনুবাদ

আপনি জন্মকাল থেকেই অন্ধ, এবং সম্প্রতি আপনার শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। আপনার দন্তরাজি জীর্ণ হয়েছে, আপনার যকৃতের ত্রুটি ঘটেছে এবং আপনার কাশির সঙ্গে সশব্দে কফ নির্গত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের দেহে বার্ধক্যের যে সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল, সেগুলি সবই একে একে সতর্কতার ইঙ্গিত জানাচ্ছিল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, এবং তবুও তিনি নির্বোধের মতো তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়েই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে বিদুর যে সমস্ত লক্ষণগুলি দেখেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে অবক্ষয় বা মৃত্যুর চরম আঘাত আসার পূর্বে জড় দেহের ক্রমশ ক্ষয়ের চিহ্ন। দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকাল তার স্থিতি হয়, অন্য আরও দেহ সৃষ্টি করে, হ্রাস পায়, এবং তারপর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু মূর্খ মানুষেরা এই নশ্বর দেহটিকে নিয়ে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চায়, এবং মনে করে যে, তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সমাজ, দেশ ইত্যাদি তাদের রক্ষা করবে। এই ধরনের বুদ্ধিভ্রষ্ট ধারণা নিয়ে, তারা সমস্ত অনিত্য আয়োজনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়, একদিন তাদের এই নশ্বর দেহটিকে ত্যাগ করে আর একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হবে, এবং তখন এই দেহটিকে নিয়ে আর একটি সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের আয়োজন করতে হবে, এবং অবশেষে আবার বিনষ্ট হয়ে যেতে হবে। তারা তাদের নিত্য পরিচয়ের কথা ভুলে গিয়ে, তাদের প্রধান কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে, নির্বোধের

মতো অনিত্য সমস্ত কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়। বিদুরের মতো সাধু এবং মহাত্মারা এই ধরনের মূর্খ-মানুষদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে প্রকৃত পরিস্থিতির মাঝে জাগরিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা এই ধরনের সাধু এবং মহাত্মাদের সমাজের বোঝা বলে মনে করে, এবং তাদের প্রায় কেউই এই ধরনের সাধু মহাত্মাদের উপদেশ শ্রবণ করতে চায় না, যদিও যে সমস্ত তথাকথিত সাধু এবং মহাত্মারা তাদের জড়-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যোগাবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদেরই তারা সাদরে অভ্যর্থনা করে থাকে। বিদুর সেই ধরনের কোন সাধু ছিলেন না যে, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রান্ত আবেগানুভূতির সন্তোষবিধান করবেন। তিনি শুধুই যথাযথভাবে জীবনের প্রকৃত অবস্থা, এবং কিভাবে মানুষ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সেই কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ২৩

অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যথা ভবান্ ।
ভীমাপবর্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ২৩ ॥

অহো—আহা; **মহীয়সী**—বলবতী; **জন্তোঃ**—প্রাণীদের; **জীবিত-আশা**—বেঁচে থাকার বাসনা; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি; **ভীমা**—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের (যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা); **অপবর্জিতম্**—উচ্ছিষ্ট; **পিণ্ডম্**—অন্ন; **আদত্তে**—গ্রহণ করছ; **গৃহ-পাল-বৎ**—গৃহপালিত কুকুরের মতো।

অনুবাদ

আহা, কোনও জীবের বেঁচে থাকার আশা কী বলবতী! যথার্থই, আপনি ঠিক একটা পোষা কুকুরের মতোই বেঁচে রয়েছেন আর ভীমের দেওয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করছেন।

তাৎপর্য

রাজাদের কিংবা বিত্তশালী লোকেদের অনুগ্রহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে কোনও সাধু ব্যক্তির পক্ষে কখনই তাদের তোষামোদ করা উচিত নয়। গৃহস্থদের কাছে জীবনের নগ্ন সত্য ব্যক্ত করাই কোন সাধুর কাজ, যাতে তারা জড় অস্তিত্বের মাঝে শোচনীয় জীবনধারা সম্পর্কে কাণ্ড জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

গার্হস্থ্য জীবনে আসক্ত কোনও বৃদ্ধ মানুষের এক অতি জাজ্বল্যমান যথার্থ দৃষ্টান্ত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। প্রকৃত অর্থেই তিনি কপর্দকশূন্য নিঃস্ব ভিখারি হয়ে গিয়েছিলেন,

তবুও তিনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পাণ্ডবদের বাড়িতেই থাকতে চেয়েছিলেন, যে পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ সেই ভীম নিজে ধৃতরাষ্ট্রের দুই বিশিষ্ট পুত্র দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে বধ করেছিলেন। এই দুটি ছেলে তাদের নীচতা আর নৃশংসতার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বড়ই প্রিয় ছিল, এবং ভীমের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ, তিনি এই দুই আদুরে ছেলেকেই বধ করেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কেন সেই পাণ্ডবদের বাড়িতেই বাস করছিলেন? কারণ তিনি সকল রকমের লাঞ্ছনা অবমাননা সত্ত্বেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলেন। জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ যে কত প্রবল, তা লক্ষ্য করে বিদুর তাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। জীবন ধারণ করে থাকার এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও প্রাণী নিত্যকালই এক জীবসত্তা এবং তার শারীরিক আবাসন কখনই সে বদলাতে চায় না।

নির্বোধ মূর্খ মানুষ জানে না যে, একটা কারাদণ্ডের বিশেষ মেয়াদ কাটানোর জন্যই তাকে শারীরিক অস্তিত্বের একটা বিশেষ মেয়াদ বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং মানব-শরীরটা বরাদ্দ করা হয়েছে বহু বহু জন্ম-মৃত্যুর পরে, একটা সুযোগের মতো, যাতে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে আপন আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারা যায়।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষেরা কিছু লাভ আর আগ্রহের আসক্তি নিয়ে এক স্বাচ্ছন্দ্যময় মর্যাদার মাঝে সেখানেই বেঁচে থাকার মতলব করে থাকে, কারণ সব কিছু তারা যথাযথভাবে দেখে না, বোঝে না।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ আর তাই তিনি জীবনের সব রকমের প্রতিকূলতার মাঝেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকবার আশা পোষণ করতেই থাকেন।

বিদুরের মতো কোন সাধুর কাজই হচ্ছে ঐ ধরনের অন্ধ মানুষদের জাগিয়ে তোলা এবং সেইভাবে তাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সহায়তা করা—যে-ধামে জীবন হল নিত্য শাশ্বত। সেখানে একবার গেলে, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ এই জড় জগতে কেউ আর ফিরে আসতে চায় না। আমরা তাই ঠিকই বুঝতে পারি, মহাত্মা বিদুরের মতো এক সাধু-জনের ওপর যে-কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তা কতখানি দায়িত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তদ্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অগ্নি—আগুন; **নিসৃষ্টঃ**—প্রক্ষিপ্ত; **দত্তঃ**—দেওয়া হয়েছিল; **চ**—এবং; **গরঃ**—বিষ; **দারা**—ধর্মপত্নী; **চ**—এবং; **দূষিতাঃ**—অপমানিতা; **হৃতম্**—অপহৃত; **ক্ষেত্রম্**—রাজ্য; **ধনম্**—ধন সম্পদ; **যেষাম্**—যাদের; **তৎ**—তাদের; **দত্তৈঃ**—দেওয়া; **অসুভিঃ**—প্রাণ ধারণ করা; **কিয়ৎ**—অপ্রয়োজনীয়।

অনুবাদ

যাদের আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে অধঃপতিত জীবন যাপন করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের স্ত্রীদেরও একজনকে অপমানিতা করেছিলেন এবং তাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থায় মনুষ্য জীবনের একটি অংশ আত্ম-উপলব্ধির জন্য এবং মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তা হল জীবনের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষেরা, তাদের জরাজীর্ণ পরিণত বয়সেও, শত্রুদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার মতো অধঃপতিত পরিস্থিতির মাঝেও গৃহবাসী হয়ে থাকতে চায়।

বিদুর এই বিষয়টি নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই ধরনের অবমাননাকর দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার থেকে তাঁর পুত্রদের মতোই মৃত্যুবরণ করা আরও ভাল হত, একথাটি তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ হাজার বছর আগে একজন ধৃতরাষ্ট্রই ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যেক ঘরেই ধৃতরাষ্ট্ররা রয়েছেন। রাজনীতিবিদেরা বিশেষত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ না মৃত্যুর করাল হাত তাঁদের জোর করে টেনে নিয়ে যায় কিংবা কোন বিরোধী জনের দ্বারা নিহত হন।

কারও পক্ষে মানব জীবনের শেষ পর্যন্ত পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবন ধারায় লিপ্ত হয়ে থাকা অধঃপতনের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত এবং এই মুহূর্তেও ঐ ধরনের ধৃতরাষ্ট্রদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিদুরদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

শ্লোক ২৫

তস্যাপি তব দেহঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ ।
পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥ ২৫ ॥

তস্য—তার; **অপি**—সত্ত্বেও; **তব**—আপনার; **দেহঃ**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **কৃপণস্য**—কৃপণের; **জিজীবিষোঃ**—বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক আপনার; **পরৈতি**—ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; **অনিচ্ছতো**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **জীর্ণঃ**—জীর্ণ; **জরয়া**—জরার প্রভাবে; **বাসসী**—বস্ত্রাদি; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

মৃত্যুবরণে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, আপনার কার্পণ্যদুষ্ট দেহটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃপণস্য জিজীবিষোঃ কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। একজনকে বলা হয় *কৃপণ*, আর অন্যজনকে বলা হয় *ব্রাহ্মণ*। কৃপণ তার জড় দেহটির যথার্থ মূল্যই বোঝে না, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের তাঁর নিজের আত্মসত্তার এবং জড় দেহটির যথার্থ মূল্যবোধ আছে। কৃপণ তার জড় দেহটির ভ্রান্ত মূল্যবোধ নিয়ে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়, এবং বৃদ্ধ বয়সেও ডাক্তারী চিকিৎসা বা অন্য কিছুর সাহায্যে যুবক হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

ধৃতরাষ্ট্রকে এখানে *কৃপণ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর জড় দেহের যথার্থ মূল্যায়ন না করেই তিনি যে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকতে চান। বিদুর তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে তাঁকে দেখাতে চাইছেন যে, তাঁর আয়ুষ্কালের বেশি মেয়াদ তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন না এবং মৃত্যুর জন্য তাঁকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। যেহেতু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবে কেন তিনি এই রকম অবমাননাকর অবস্থা মেনে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবেন? তার চেয়ে বরং সঠিক পথ অবলম্বন করাই উচিত, তাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও ভাল।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল, জড় অস্তিত্বের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করা, এবং জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অর্জিত শক্তির আশী শতাংশই অপচয় করে ফেলেছিলেন, তাই তাঁর কার্পণ্যদুষ্ট জীবনের বাকি দিন কটা পরম মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর নেমে এসেছিল।

এই ধরনের জীবনকে কার্পণ্যদুষ্ট বলা হয়, কারণ মনুষ্য জীবনের সম্পদের সদ্ব্যবহার সে করতে পারে না। শুধুই সৌভাগ্যবলে এই ধরনের কার্পণ্যদুষ্ট মানুষ বিদুরের মতো কোনও এক আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে, এবং তাঁর উপদেশে জড়-অস্তিত্বের অজ্ঞানতা থেকে তখন সে অব্যাহতি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥

গত-স্ব-অর্থম্—যথাযথ সদ্ব্যবহার না করে; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—জড় দেহ; **বিরক্তঃ**—আসক্তিশূন্য; **মুক্ত**—মুক্ত; **বন্ধনঃ**—সকল দায়দায়িত্ব থেকে; **অবিজ্ঞাত-গতিঃ**—অজ্ঞাত পরিণাম; **জহ্যাৎ**—দেহত্যাগ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ধীরঃ**—অবিচলিত; **উদাহৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

তাঁকেই ধীর বলা হয় যিনি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে চলে যান, এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, জড় দেহটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

মহান্ ভক্ত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন ঃ

'হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥'

অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উপযোগী জ্ঞানচর্চা করার উদ্দেশ্যেই মানবদেহটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে এটি নিয়োজিত না হলে জীবন মাত্রই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব, এই ধরনের সংস্কৃতিপূর্ণ কার্যকলাপের চর্চা অনুশীলন না করে জীবনটাকে যে নষ্ট করে ফেলেছে, তাকে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সেইভাবে সংসার

পরিবারবর্গ, সমাজ, দেশ প্রভৃতির সব কিছু দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কোনও এক অজ্ঞাতস্থানে দেহত্যাগ করতে তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে অন্যেরা কেউ জানতে না পারে কোথায় এবং কিভাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে।

'ধীর' মানে অবিচলিত; যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও যিনি বিচলিত হন না। স্ত্রী-সন্তানাদির সাথে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক থাকার ফলে মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক জীবনধারা ত্যাগ করতে পারে না। সংসার-পরিবারের প্রতি এই ধরনের অহেতুক স্নেহ-মমতার দ্বারা আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং যদি কেউ ঐ ধরনের সম্পর্ক একেবারেই ভুলে যেতে পারে, তবে তাকে বলা হয় অবিচল, অর্থাৎ *ধীর।*

এটা অবশ্য হতাশাগ্রস্ত জীবনধারা থেকে উদ্ভূত ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথ, তবে ঐ ধরনের ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্থিতিশীলতা সম্ভবপর হয় একমাত্র যথার্থ সাধুসন্ত এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাদের সঙ্গ-সান্নিধ্যেরই মাধ্যমে, যার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবার চর্চায় নিয়োজিত হয়ে যেতে পারে।

সেবাভাবের অপ্রাকৃত পারমার্থিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার সাহায্যেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মে আন্তরিক আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সাথে সঙ্গ-সান্নিধ্যের মাধ্যমেই তা সার্থক হয়ে ওঠে।

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, এমন একটি ভাইকে তিনি পেয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্যই এই হতাশাচ্ছন্ন জীবনে হয়ে উঠেছিল মুক্তি পথের সন্ধান।

শ্লোক ২৭

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্ ।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **স্বকাৎ**—স্বকীয় উদ্যোগে; **পরতঃ বা**—অথবা অন্যের কাছ থেকে শুনে; **ইহ**—এখানে এই জগতে; **জাত**—হন; **নির্বেদঃ**—জড় আসক্তি থেকে নিস্পৃহ; **আত্মবান্**—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **হরিম্**—পরম পুরুষ ভগবান; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে; **প্রব্রজেৎ**—চলে যান; **সঃ**—তিনি হলেন; **নর-উত্তমঃ**—সর্বোত্তম মানবসত্তা।

অনুবাদ

যিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অলীক মায়া আর দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেন, এবং তাই

গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মানবসত্তা।

তাৎপর্য

তিন শ্রেণীর পরমার্থবাদী আছেন, তাঁরা হলেন, (১) *ধীর,* অর্থাৎ যিনি পরিবার পরিজনদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিচলিত নন, (২) হতাশাচ্ছন্ন ভাবাবেগ নিয়ে কোনও *সন্ন্যাসী* , এবং (৩) পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠাবান ভক্ত , যিনি শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্-চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে গৃহত্যাগ করেন।

ভাবধারাটি এই যে, জড় জগতে হতাশাচ্ছন্ন জীবনের অনুভূতি অর্জনের পরে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলে সেটা আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রগতির সোপান হতে পারে, *তবে মুক্তিপথের সার্থক সিদ্ধিলাভ ঘটে থাকে তখনই , যখন মানুষ প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ওপরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।*

কোনও মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিঃসঙ্গভাবে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলে বাস করতে পারে, কিন্তু দৃঢ়মতি নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, তিনি নিঃসঙ্গ নন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর সাথেই আছেন, এবং যে কোনও সঙ্কটময় পরিস্থিতির মাঝেই তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তকে নিরাপদে রাখতে পারেন।

অতএব শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যেই ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত, এবং এই অনুশীলন ভক্তের লক্ষ্য লাভের ঐকান্তিকতার অনুপাত অনুসারে তার ভগবৎ-চেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

এই ধরনের ভক্তিমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে জড়জাগতিক বিষয়লাভের বাসনা যে করে, সে কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানে ভরসা রাখতে পারে না, যদিও তিনি প্রত্যেকেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। যে সব মানুষ জড়জাগতিক সুবিধাদি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পূজা করে, পরমেশ্বর ভগবানও তাদের কোন রকম পথ নির্দেশ করেন না। ঐ ধরনের জড়-বিষয়াসক্ত ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদে জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি পেতে পারে। কিন্তু উপরে বর্ণিত সর্বোত্তম মানবসত্তার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, নরোত্তম হতে পারে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ঐ ধরনের নিষ্ঠাবান ভক্তমণ্ডলীর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং আত্ম-উপলব্ধি অর্জনের পথে তাঁরাই আমাদের পথ-প্রদর্শক। মহাত্মা বিদুর হলেন পরমেশ্বর ভগবানের সেই ধরনেরই এক মহান্ ভক্ত, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রীপাদপদ্মাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করাই আমাদের সকলের উচিত।

শ্লোক ২৮

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্ ।
ইথোঽর্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥ ২৮ ॥

অথ—অতএব; **উদীচীম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **যাতু**—গমন করুন; **স্বৈঃ**—আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা; **অজ্ঞাত**—অজ্ঞাতসারে; **গতিঃ**—গতিবিধি; **ভবান্**—আপনার নিজের; **ইতঃ**—এরপর; **অর্বাক্**—আসছে; **প্রায়শঃ**—প্রায়ই; **কালঃ**—সময়; **পুংসাম্**—মানুষদের; **গুণ**—গুণাবলী; **বিকর্ষণঃ**—বিকর্ষণ করে বা নষ্ট করে।

অনুবাদ

অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে, যার প্রভাবে মানুষদের সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

মানুষ তার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনের ক্ষতিপূরণ করতে পারে *ধীর* হওয়ার মাধ্যমে; অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না রেখে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করার মাধ্যমে। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অচিরেই সেই পন্থা অবলম্বন করতে, কারণ কলিকাল অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। জড় জগতের সান্নিধ্যের প্রভাবে বদ্ধ জীব এমনিতেই অধঃপতিত, তার উপর কলিযুগে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণাবলী হ্রাস পেতে পেতে সব চেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে অধঃপতিত হবে। কলিযুগের আগমনের পূর্বেই তাঁকে গৃহত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ বিদুরের অমূল্য উপদেশের প্রভাবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতি দ্রুত আসন্ন কলিযুগের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সাধারণ মানুষের পক্ষে নরোত্তম হওয়া, বা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায় (৭/২৮)* বলা হয়েছে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে পারেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি প্রথমেই সন্ন্যাসী বা নরোত্তম হওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি যেন অন্তত *ধীর* হন। নিরন্তর পরমার্থ লাভের প্রয়াস করার ফলে মানুষ *ধীর* স্তর থেকে নরোত্তম স্তরে উন্নীত হতে পারেন। দীর্ঘকাল যোগ অনুশীলনের ফলে ধীর স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, কিন্তু বিদুরের মতো মহাত্মার কৃপায়, কেবলমাত্র সেই স্তর অবলম্বন করার বাসনা করার মাধ্যমেই তৎক্ষণাৎ সেই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, সেটাই হল সন্ন্যাস আশ্রমের প্রস্তুতি পর্যায়। সন্ন্যাস স্তর হচ্ছে পরমহংস স্তরের প্রস্তুতি, বা ভগবানের উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়ার প্রস্তুতি।

শ্লোক ২৯

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন
প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিত আজমীঢ়ঃ ।
ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **রাজা**—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র; **বিদুরেণ অনুজেন**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের দ্বারা; **প্রজ্ঞা**—জ্ঞান; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **বোধিতঃ**—বুঝতে পেরে; **আজমীঢ়ঃ**—আজমীঢ় বংশজ ধৃতরাষ্ট্র; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **স্বেষু**—আত্মীয়বর্গের; **স্নেহপাশান্**—স্নেহপাশ; **দ্রঢ়িম্নঃ**—চিত্তের দৃঢ়তা; **নিশ্চক্রাম্**—বেরিয়ে পড়লেন; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভাই বিদুর কর্তৃক; **সন্দর্শিত**—প্রদর্শিত; **অধ্বা**—মুক্তির পথ।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আজমীঢ় বংশজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে মুক্তিলাভের পথে বহির্গত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর মহান্ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধুসঙ্গ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গের মহিমা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—*"লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয়"*। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সাথে মাত্র কয়েক মিনিটের প্রথম সঙ্গ প্রভাব না পেলে আমাদের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা দেওয়ার মতো সুবিপুল কার্যভার গ্রহণ করা সম্ভব হত না। সেই বিশেষ সময়ে তাঁর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎকার না হত, তা হলে হয়ত আজ আমরা বিপুল ব্যবসায়ীতে পরিণত হতে পারতাম, কিন্তু সেই মহাপুরুষের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারতাম না।

বিদুরের সঙ্গ প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তন তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক বন্ধনের জালে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তথাকথিত সাফল্য লাভের সব রকম চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই জড়জাগতিক কার্যকলাপে তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর ব্যর্থতার জীবন সত্ত্বেও সর্বোত্তম সাধু, ভগবানের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে জীবনের চরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র সাধুর সঙ্গ করা উচিত, এবং তার ফলে সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে জড় জগতের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগৎ হচ্ছে একটি মহামায়া, কারণ এখানে সব কিছুই বাস্তব সত্য বলে মনে হলেও পর মুহূর্তেই তা সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়। আকাশের মেঘকে নিঃসন্দেহে বাস্তব বলে মনে হয়, কারণ তার থেকে বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টির ফলে কত অস্থায়ী সবুজ গাছপালার জন্ম হয়, কিন্তু চরমে সব কিছুই অন্তর্হিত হয়ে যায়—মেঘ, বৃষ্টি এবং উদ্ভিদ, সবই যথাসময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ থাকে, এবং আকাশের বুকে বিভিন্ন রকমের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী চিরকাল বিরাজমান থাকে।

তেমনই, পরম সত্য আকাশের মতো চিরকাল বিরাজমান থাকে, কিন্তু অনিত্য মেঘের মতো, মায়া আসে এবং মিলিয়ে যায়। মূর্খ জীবসত্তারা অনিত্য মেঘের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা বৈচিত্র্যমণ্ডিত নিত্য শাশ্বত আকাশের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

শ্লোক ৩০

পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী
পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী ।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং
মনস্বিনামিব সৎ সম্প্রহারঃ ॥ ৩০ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **প্রয়ান্তম্**—যখন গৃহ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন; **সুবলস্য**—মহারাজ সুবলের; **পুত্রী**—সুযোগ্য কন্যা; **পতিব্রতা**—পতিপরায়ণা; **চ**—ও; **অনুজগাম**—অনুগমন করেছিলেন; **সাধ্বী**—সুশীলা; **হিমালয়ম্**—হিমালয় পর্বতমালা অভিমুখে; **ন্যস্ত-দণ্ড**—সন্ন্যাস দণ্ড যিনি গ্রহণ করেছেন; **প্রহর্ষম্**—হর্ষপ্রদ; **মনস্বিনাম্**—মনস্বীদের; **ইব**—মতো; **সৎ**—উপযুক্ত; **সম্প্রহারঃ**—তীব্র আঘাত।

অনুবাদ

যুদ্ধে তীব্র আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্ত যোদ্ধার মতো সন্ন্যাসদণ্ড অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দদায়ক যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিমুখে তাঁর পতিকে গমন করতে দেখে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগামিনী হলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ সুবলের কন্যা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ছিলেন আদর্শ পতিব্রতা রমণী। বৈদিক সভ্যতায় রমণীদের বিশেষ করে পতিব্রতা সতী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিহাসে যে সমস্ত সতী নারীর উল্লেখ করা হয়েছে, গান্ধারী তাঁদের অন্যতমা। লক্ষ্মী সীতাদেবীও ছিলেন এক মহান্ রাজার কন্যা, কিন্তু তিনিও তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী হয়ে বনে গিয়েছিলেন।

তেমনই, একজন মহিলা হিসাবে গান্ধারী ইচ্ছা করলে তাঁর গৃহে অথবা তাঁর পিতৃগৃহে থাকতে পারতেন, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীরূপে তিনি কোনও রকম সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করেই তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আশ্রম অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং গান্ধারী সেই সময় তাঁর পতির পাশে ছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে তাঁর অনুগামিনী হতে বলেননি, কারণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সব রকম বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অবিচলিত যোদ্ধার মতো তিনি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই ছিলেন। তিনি আর

তখন তথাকথিত পত্নী অথবা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, এবং তিনি স্থির করেছিলেন একাকী গৃহত্যাগ করতে, কিন্তু পতিব্রতা সতী গান্ধারী তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁর পতির অনুগামিনী হওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই আশ্রমে পত্নী পতির স্বেচ্ছাসেবী সহগামিনী হতে পারেন, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমে পত্নী আর পূর্বাশ্রমের পতির সঙ্গে থাকতে পারেন না। সন্ন্যাসীকে সামাজিক ভাবনায় মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়, এবং তাই সন্ন্যাসীর পত্নী সামাজিক দৃষ্টিতে বিধবা হয়ে যান এবং তাঁর পূর্বতন স্বামীর সাথে কোনও সংযোগ থাকে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সতী স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেননি, এবং তাই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গান্ধারী তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতীক স্বরূপ সন্ন্যাসীরা একটি দণ্ড গ্রহণ করেন। যাঁরা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করেন, তাঁরা একদণ্ড গ্রহণ করেন, কিন্তু যাঁরা বৈষ্ণব দর্শন অনুসরণ করেন, তাঁরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের বলা হয় একদণ্ডী স্বামী, আর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের বলা হয় ত্রিদণ্ডী স্বামী, অথবা মায়াবাদীদের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষভাবে নিরূপণ করে তাঁদের বলা হয় ত্রিদণ্ডী গোস্বামী। একদণ্ডী স্বামীরা সাধারণত হিমালয়ের প্রতি আসক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা বৃন্দাবন অথবা জগন্নাথপুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন *নরোত্তম*, আর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন *ধীর*। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে *ধীর* হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষে কখনো *নরোত্তম* হওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ৩১

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নি-
র্বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ ।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন চা পশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥ ৩১ ॥

অজাতশত্রুঃ—যাঁর শত্রু জন্মগ্রহণ করেনি অর্থাৎ যাঁর কোন শত্রু নেই; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **মৈত্রঃ**—দেবতাদের বন্দনা করে; **হুত অগ্নিঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **তিল-গো-ভূমি-রুক্মৈঃ**—শস্য, গাভী, ভূমি এবং সোনা দিয়ে; **গৃহম্**—প্রাসাদে; **প্রবিষ্টঃ**—

প্রবেশ করে; **গুরু-বন্দনায়**—গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য; **ন**—না; **চ**—ও; **অপশ্যৎ**—দেখে; **পিতরৌ**—তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরকে; **সৌবলীম্**—গান্ধারীকে; **চ**—ও।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য সমাপন করে তিল, গাভী, ভূমি ও রত্নাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে ও গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক রাজা, কারণ তিনি নিজে প্রতিদিন গার্হস্থ্য আশ্রমের পবিত্র কর্তব্যকর্মাদি অনুষ্ঠান করতেন। গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ঊষাকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বন্দনা সহকারে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা, ব্রাহ্মণদের শস্য, গাভী, ভূমি, স্বর্ণ ইত্যাদি দান করা, এবং অবশেষে গুরুজনদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করা। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুশীলন না করে কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান নিয়েই সজ্জন হওয়া যায় না। আধুনিক যুগের গৃহস্থদের জীবনধারা অন্য রকম, তারা অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে এবং তারপর স্নানাদি শৌচক্রিয়া এবং উল্লিখিত ধর্মাচরণগুলি না করেই বিছানায় বসে চা খায়। গৃহস্থ শিশুরাও তাদের পিতামাতার আচরণেরই অনুকরণ করে, এবং তাই সমস্ত সমাজ নরকগামী অধঃপতনের পথে দ্রুত নেমে চলে। যদি তারা সাধু সঙ্গ না করে, তা হলে তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিষয়াসক্ত মানুষেরা বিদুরের মতো সাধুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন, এবং তার ফলে আধুনিক যুগের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর দুই পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারীর সাথে রাজপ্রাসাদে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত সচিব সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ ॥ ৩২ ॥

তত্র—সেখানে; **সঞ্জয়ম্**—সঞ্জয়ের কাছে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **উদ্বিগ্ন মানসঃ**—উদ্বিগ্নচিত্ত; **গাবল্গণে**—গবল্গণ-পুত্র সঞ্জয়কে; **ক্ব**—কোথায়; **নঃ**—আমাদের; **তাতঃ**—খুল্লতাত; **বৃদ্ধ**—স্থবির; **হীন চ নেত্রয়োঃ**—নেত্রহীন।

অনুবাদ

উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেখানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়, আমাদের বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতৃব্য কোথায়?

শ্লোক ৩৩

অম্বা চ হতপুত্রার্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ ।
অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্যয়া ।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ ॥ ৩৩ ॥

অম্বা—মাতা; **চ**—এবং; **হত-পুত্রা**—যিনি তাঁর সমস্ত পুত্রদের হারিয়েছেন; **আর্তা**—শোককাতরা; **পিতৃব্য**—খুল্লতাত বিদুর; **ক্ব**—কোথায়; **গতঃ**—গিয়েছেন; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **অপি**—কি; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অকৃত-প্রজ্ঞে**—অকৃতজ্ঞ; **হত-বন্ধু**—যিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হারিয়েছেন; **সঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নীসহ; **আশংসমানঃ**—আশঙ্কিত চিত্তে; **শমলম্**—অপরাধ; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার জলে; **দুঃখিত**—দুঃখিত চিত্তে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছেন।

অনুবাদ

আমাদের পরম আত্মীয় খুল্লতাত বিদুর এবং হত-পুত্র শোককাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়েছেন? আমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিরহকাতর। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপরাধে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন?

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা, বিশেষ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তাই অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। ভগবানের ইচ্ছায় সেই যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরিবারে তার মর্মান্তিক পরিণতি, যা

তাঁরা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সব সময় তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তাঁদের শোকগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি সর্বতোভাবে তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। তাই প্রাসাদে তাঁদের দেখতে না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিত্তে আশঙ্কার উদয় হয়েছিল, এবং তিনি অনুমান করেছিলেন যে, তাঁরা হয়ত গঙ্গার জলে নিমগ্ন হয়েছেন।

তিনি নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেছিলেন, কারণ তাঁরা যখন পিতৃহীন হয়েছিলেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত পুত্রদের হত্যা করেছেন। পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর নিজের সমস্ত অপরিহার্য দুষ্কর্মের কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং তিনি কখনোই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দুষ্কর্মের কথা মনে রাখেননি। ভগবানের ইচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্কর্মের ফল ভোগ করেছিলেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল তাঁর নিজেরই অপরিহার্য দুষ্কর্মগুলির কথা মনে করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এইটিই সজ্জন ভগবদ্ভক্তের প্রকৃতি। কোন ভগবদ্ভক্ত কখনো অন্যের দোষ খোঁজেন না, কেবল নিজের দোষ-ত্রুটিগুলিই খোঁজেন এবং এইভাবে যতদূর সম্ভব নিজেকে সংশোধন করেন।

শ্লোক ৩৪

পিতর্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্ ।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ ॥ ৩৪ ॥

পিতরি—আমাদের পিতার; **উপরতে**—শয্যাগত হলে; **পাণ্ডৌ**—মহারাজ পাণ্ডু; **সর্বান্**—সকলের; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃদঃ**—সুহৃদ্‌বর্গ; **শিশুন্**—শিশুরা; **অরক্ষতাম্**—রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন; **ব্যসনতঃ**—সব রকম বিপদ থেকে; **পিতৃব্যৌ**—পিতৃব্য দুজন; **ক্ব**—কোথায়; **গতৌ**—গেছেন; **ইতঃ**—এখান থেকে।

অনুবাদ

যখন আমাদের পিতা পাণ্ডু শয্যাগত হলেন, এবং আমরা সকলে নিতান্ত শিশু, তখন এই দুই পিতৃব্য আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী। হায়, তাঁরা এখান থেকে কোথায় গেলেন?

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্শিতঃ ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **কৃপয়া**—করুণার বশে; **স্নেহ-বৈক্লব্যাৎ**—গভীর স্নেহজনিত মানসিক বিকার; **সূতঃ**—সঞ্জয়; **বিরহ-কর্শিতঃ**—বিরহজনিত কাতরতা; **আত্ম-ঈশ্বরম্**—তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে; **অচক্ষণঃ**—না দেখে; **ন**—করলেন না; **প্রত্যাহ**—প্রত্যুত্তর; **অতি-পীড়িত**—অত্যন্ত কাতর হয়ে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহকাতর সঞ্জয় দয়া এবং স্নেহজনিত বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সঞ্জয় দীর্ঘকাল ধরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত সহকারী ছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি ধৃতরাষ্ট্রের জীবন পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর তিনি যখন দেখলেন যে, অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র কাউকে না জানিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন তাঁর দুঃখের সীমা রইল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হলেন, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের খেলায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর লোকবল ও অর্থবল সব কিছুই হারিয়ে ছিলেন, এবং অবশেষে গভীর নৈরাশ্যে রাজা এবং রানীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। সঞ্জয় তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন না যে, বিদুরের সঙ্গপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল এবং তাই তিনি এক শ্রেয় জীবনধারা লাভ করার উদ্দেশ্যে হর্ষোৎফুল্ল উদ্দীপনায় গৃহের অন্ধকূপ ত্যাগ করেছেন। বর্তমান জীবনধারা ত্যাগ করে উন্নততর এক জীবনচর্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হলে, বর্তমান জীবন ত্যাগ করে নিছক কৃত্রিম বেশ ধারণ করলে বা গৃহ থেকে বাইরে বসবাস করলেই কেউ সন্ন্যাস আশ্রমে টিকে থাকতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা ।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩৬ ॥

বিমৃজ্য—মুছে; **অশ্রূণি**—চোখের জল; **পাণিভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **বিষ্টভ্য**—ধৈর্যযুক্ত হয়ে; **আত্মানম্**—মনকে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **অজাত শত্রুম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **প্রত্যূচে**—প্রত্যুত্তর দিলেন; **প্রভোঃ**—তাঁর প্রভুর; **পাদৌ**—পদযুগল; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে, অজাতশত্রু মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৭

সঞ্জয় উবাচ

নাহং বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্বঃ কুলনন্দন ।
গান্ধার্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ ॥ ৩৭ ॥

সঞ্জয় উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানা; **ব্যবসিতং**—অভিপ্রায়; **পিত্রোঃ**—আপনার পিতৃব্য; **বঃ**—আপনার; **কুলনন্দন**—হে কুরুবংশের বংশধর; **গান্ধার্যা**—গান্ধারীর; **বা**—অথবা; **মহাবাহো**—হে মহারাজ; **মুষিতঃ**—বঞ্চিত; **অস্মি**—হয়েছি; **মহা-আত্মভিঃ**—সেই মহাত্মাদের দ্বারা।

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে কুরুবংশের বংশধর, আপনার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।

তাৎপর্য

মহাত্মারা যে প্রবঞ্চনা করতে পারেন, সেকথা শুনতে যেন কেমন আশ্চর্য লাগে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাত্মারা অন্যদের কখনো প্রবঞ্চনা করে থাকেন। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের কাছে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান তা চেয়েছিলেন, এবং তাই সেই উদ্দেশ্যটি নিঃসন্দেহে মহান্। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে স্বীয় বৃত্তির দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সেইটিই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত।* গান্ধারী সহ ধৃতরাষ্ট্র যখন বিদুরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি সঞ্জয়কেও তাঁদের অভিপ্রায় জানাননি, যদিও তাঁর একান্ত সহকারী রূপে সঞ্জয় সব সময়ই তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সঞ্জয় কখনও ভাবেননি যে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে ধৃতরাষ্ট্র কখনও কোন কিছু করতে পারেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এত গোপনে গৃহত্যাগ করেছিলেন যে, তা তিনি সঞ্জয়কেও পর্যন্ত জানাতে পারেননি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীও যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাচ্ছিলেন, তখন কারাধ্যক্ষকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন, এবং তেমনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁদের কুলপুরোহিতকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা করা হয় তা সবই শুভ, কারণ সেই কার্য পরম তত্ত্বের সাথে সম্পর্কবদ্ধ। আমরাও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পরিবারের সকলকে প্রতারণা করার সুযোগ নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলাম। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের প্রতারণার প্রয়োজন ছিল, এবং এই ধরনের অপ্রাকৃত প্রতারণার ফলে কারোরই ক্ষতি হয় না।

শ্লোক ৩৮

অথাজগাম ভগবান্ নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চয়ন্মুনিম্ ॥ ৩৮ ॥

**যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ । স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (গীতাঃ ১৮/৪৬)*
অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ । স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ (ভাঃ ১/২/১৩)

অথ—তারপর; **আজগাম**—উপস্থিত হলেন; **ভগবান্**—মহা ভাগবত; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সহ-তুম্বুরুঃ**—তাঁর বীণা বাদ্যযন্ত্র হস্তে; **প্রত্যুত্থায়**—তাঁদের আসন থেকে উঠে; **অভিবাদ্য**—তাঁদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে; **আহ**—বললেন; **স-অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহ; **অভ্যর্চয়ন্**—যথাযোগ্য পূজা অভ্যর্থনা জানিয়ে; **মুনিম্**—দেবর্ষিকে।

অনুবাদ

সঞ্জয় যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হস্তে মহাভাগবত নারদ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত বলে নারদ মুনিকে এখানে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবান এবং ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সমপর্যায়ে বিবেচনা করেন।

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে তাঁরা সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন এবং মায়াবদ্ধ উন্মাদ জীবদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করে তাদের মানসিক সুস্থিরতার স্তরে উন্নীত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে জীব কখনই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়ে পারে না, কারণ ভগবানের ভক্ত হওয়াই তার স্বরূপসিদ্ধ মর্যাদা, কিন্তু কেউ যখন অভক্ত বা নাস্তিক হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তির জীবনধারা সুস্থ অবস্থায় নেই। ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা এই ধরনের মোহাচ্ছন্ন জীবদের পরিচর্যা করেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের চোখে অত্যন্ত প্রিয়।

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা অবিশ্বাসী অভক্তদের ভগবদ্ভক্ত করে তোলার প্রয়াসে তাদের মধ্যে যথার্থই তাঁর মহিমা প্রচার করেন, তাঁর কাছে তাঁদের চেয়ে প্রিয় আর কেউ নয়। স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয়, নারদ মুনির মতো এই ধরনের বিশিষ্ট মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে সেই ভাবেই উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্তব্য এবং নারদ মুনির মতো এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যে তাঁর বীণা নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ছাড়া আর কোনও কাজ করতেন না, তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর মহান্ ভ্রাতারা সহ, যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

শ্লোক ৩৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ব গতাবিতঃ ।
অম্বা বা হতপুত্রার্তা ক্ব গতা চ তপস্বিনী ॥ ৩৯ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানা; **গতিম্**—গমন করেছেন; **পিত্রোঃ**—পিতৃব্যদের; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ক্ব**—কোথায়; **গতৌ**—গিয়েছেন; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অম্বা**—মাতা; **বা**—অথবা; **হত-পুত্রা**—যাঁর পুত্রেরা মারা গেছেন; **আর্তা**—শোকার্তা; **ক্ব**—কোথায়; **গতা**—গিয়েছেন; **চ**—ও; **তপস্বিনী**—তপশ্চর্যা পরায়ণা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে ভাগবত, আমার দুই পিতৃব্য কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত পুত্রহীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপস্বিনী গান্ধারীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্বদাই তাঁর জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারীর বিপুল ক্ষতি এবং এক তপস্বিনী স্বরূপ তাঁর গভীর দুঃখের কথা মনে রেখে ছিলেন। তপস্বিনী কখনো দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হন না, এবং তার ফলে তিনি পরমার্থের পথে দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন। রানী গান্ধারী তাঁর অনবদ্য চরিত্রবলে ছিলেন বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ এক তপস্বিনী, কারণ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও তিনি ছিলেন অবিচলিত। মাতা, পত্নী এবং তপস্বিনী রূপে তিনি ছিলেন এক আদর্শ রমণী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো চরিত্র বিরল।

শ্লোক ৪০

কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ ।
অথাবভাষে ভগবান্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪০ ॥

কর্ণ-ধারঃ—কাণ্ডারী; **ইব**—মতো; **অপারে**—দুস্তর সমুদ্রে; **ভগবান্**—ভগবানের প্রতিনিধি; **পার-দর্শকঃ**—যিনি অপর পারে নিয়ে যেতে পারেন; **অথ**—এইভাবে;

অবভাষে—বলতে শুরু করলেন; **ভগবান্**—দেবতুল্য ব্যক্তি; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **মুনি-সৎ-তমঃ**—মুনি শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

আপনি মহাসাগরে কর্ণধারের মতো আমাদের লক্ষ্যপথ দেখাতে পারেন। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, দার্শনিক ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দর্শনতত্ত্বজ্ঞ নানা প্রকার মুনি আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রকম শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাই এখানে তাঁকে 'মুনি-সত্তম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বেদান্ত দর্শন-তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। অবিচলিত শ্রদ্ধা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য না থাকলে কেউ শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আমাদের অজ্ঞানতার পরপারে নিয়ে যেতে পারেন।

দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে যেতেন, কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই ছিলেন ভগবানের শুদ্ধভক্ত, এবং দেবর্ষি নারদ সব সময় তাঁদের সৎ-উপদেশ দিতে প্রস্তুত থাকতেন।

শ্লোক ৪১

নারদ উবাচ

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **মা**—কখনই নয়; **কঞ্চন**—যে কোন ভাবে; **শুচঃ**—শোককর; **রাজন্**—হে রাজন্; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বর-বশম্**—পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন; **জগৎ**—জগৎ; **লোকাঃ**—সমস্ত জীবেরা; **স-পালাঃ**—তাদের

নেতাসহ; **যস্য**—যার; **ইমে**—এই সমস্ত; **বহন্তি**—বহন করে; **বলিম্**—পূজার নৈবেদ্য; **ঈশিতুঃ**—সংযুক্ত; **ভূতানি**—সমস্ত জীবদের; **সঃ**—তিনি; **এব**—ও; **বিযুনক্তি**—বিযুক্ত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে ধার্মিক রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব এবং তাদের পালকবর্গ প্রার্থনা করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। ভগবানই তাদের মিলিত করেন এবং বিচ্ছিন্নও করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ অথবা চিৎ জগৎ, উভয় জগতেই প্রতিটি জীবসত্তাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করছে। এইভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়াই জীবের স্বরূপ। মূর্খ জীব, বিশেষ করে মানুষ, বৃথাই ভগবানের আইনের বিরোধিতা করে থাকে এবং তার ফলে তারা অসুর রূপে বা আইন-ভঙ্গকারীরূপে দণ্ড ভোগ করে।

ভগবানের নির্দেশ অনুসারে, জীব কোন বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, এবং ভগবানের আদেশে অথবা তাঁর প্রতিনিধির আদেশে সেই মর্যাদা থেকে আবার স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা আধুনিক যুগের ইতিহাসে নেপোলিয়ন, আকবর, আলেকজাণ্ডার, গান্ধী, সুভাষ এবং নেহেরু সকলেই ভগবানের দাস, এবং ভগবানের পরম ইচ্ছায় তাঁদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদায় তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন আবার অপসারিত হয়েছেন। তাঁদের কেউই স্বাধীন স্বতন্ত্র নন।

ঐ সব মানুষ বা নেতারা যদিও ভগবানের পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করে, তা হলেও তাদের জড় জগতের আরও কঠোর আইনের সাহায্যে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তাই মূর্খ লোকেই কেবল বলে ভগবান নেই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই নগ্ন সত্য সার্থকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কারণ তাঁর দুই বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্য এবং গান্ধারীর আকস্মিক অন্তর্ধানে তিনি দারুণ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পূর্বকৃত কর্মাদি অনুসারেই সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; ইতিপূর্বেই তাঁর প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণাম স্বরূপ সুখভোগ

বা দুর্ভোগ অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর সুকৃতির ফলে তিনি বিদুরের মতো সজ্জন এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পেয়েছিলেন, এবং তাঁর উপদেশেই তিনি জড় জগতের সমস্ত হিসাব-নিকাশের সমাধা করে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সাধারণত কেউই পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজের সুখ-দুঃখের গতি পরিমাণ বদলাতে পারে না। মহাকালের সুনিপুণ ব্যবস্থাক্রমে সেগুলি যেভাবে আসে, সেইভাবেই তা প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয়। সেগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা নিরর্থক। তাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং সেই সুযোগ কেবল উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং চেতনা সমন্বিত মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র মানুষের জন্যই মুক্তির উপায় স্বরূপ বিভিন্ন বৈদিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যারা উন্নত বুদ্ধিমত্তার এই সুযোগের অপব্যবহার করে, তারা এই জন্মে অথবা ভবিষ্যতে নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার মাধ্যমে দণ্ডভোগ করে। এইভাবে ভগবান সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪২

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ ।
বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৪২ ॥

যথা—যেমন; **গাবঃ**—গাভী; **নসি**—নাসিকার দ্বারা; **প্রোতাঃ**—আবদ্ধ; **তন্ত্যাম্**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ; **চ**—ও; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **বাক্-তন্ত্যাম্**—বৈদিক মন্ত্রজালে; **নামভিঃ**—নাম মালায়; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ হয়ে; **বহন্তি**—বহন করে; **বলিম্**—আদেশাবলী; **ঈশিতুঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

অনুবাদ

গাভী যেমন নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব, তা সে মানুষই হোক অথবা পশু বা পক্ষী হোক, মনে করে সে স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কঠোর আইন থেকে কেউই মুক্ত নয়।

ভগবানের আইন কঠোর, কারণ কোন অবস্থাতেই কেউ তা অমান্য করতে পারে না। ধূর্ত প্রবঞ্চকেরা কখনও কখনও মনুষ্যকৃত আইন ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আইন অমান্য করা কারও পক্ষেই বিন্দুমাত্রও সম্ভব নয়। ভগবানের আইনের সামান্য পরিবর্তন করা হলেও আইন অমান্যকারীর চরম বিপদ হতে পারে।

ভগবানের এই আইনকেই বলে ধর্ম, তবে বিভিন্ন অবস্থায় এই ধর্মীয় অনুশাসনের কিছু তারতম্য হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই ধর্মের মূলনীতি এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ মেনে চলা। সেইটিই জড় অস্তিত্বের শর্ত। জড় জগতে প্রতিটি জীবই স্বেচ্ছায় মায়ার বন্ধন স্বীকার করেছে বলে জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বশ্যতা স্বীকার করা।

তবে মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে, মূর্খ মানুষেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয়, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, চীনা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়ে, বিভিন্ন শাস্ত্রনীতি অথবা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করে।

রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইন হচ্ছে ভগবানের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসনের অপূর্ণ অনুকরণ। ধর্মীয় শাসনমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা ভগবৎ-চেতনা বিহীন রাষ্ট্র নাগরিকদের ভগবানের আইন ভঙ্গ করার অধিকার দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-অমান্য করতে দেয় না; তার ফলে জনসাধারণ মনুষ্যকৃত আইন অনুসরণ করলেও ভগবানের আইন অমান্য করার ফলে দণ্ডভোগ করে।

এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষই অপূর্ণ, এবং জড়জাগতিক বিচারে সব চেয়ে উন্নত মানুষও অভ্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে না। অন্য দিকে, ভগবানের আইনে ঐ ধরনের যে কোন রকম ভ্রান্তি বা অপূর্ণতা নেই। সমাজের নেতারা যদি ভগবানের আইন অবলম্বন করেন, তা হলে আর নতুন করে কোন রকম আইন তৈরি করার প্রয়োজন থাকে না। মনুষ্যকৃত আইনের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভগবানের আইনের কোনরকম পরিবর্তন করার প্রয়োজন কখনও হয় না। কারণ সেগুলি অভ্রান্ত, অচ্যুত, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রণীত।

ভগবানের প্রতিনিধি মুক্ত পুরুষেরা ধর্মীয় অনুশাসনাদি এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি বদ্ধ জীবদের জন্য তৈরি করে গেছেন. যাতে তারা সেগুলির অনুশীলন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

জীব তার প্রকৃত স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। মুক্ত অবস্থায় সে অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের সেবা করে এবং তার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের সম পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, আবার কখনও ভগবানের থেকে বেশি স্বাতন্ত্র্যও উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের দাসত্ব করার পরিবর্তে অন্য সমস্ত জীবদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়, এবং তার ফলে মায়ার বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর নিত্য দাসত্ব বরণ না করে, ততক্ষণ তাকে জড় জগতের বন্ধনে আরও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে হয়। ভগবানের শরণাগতিই জড় জগতের বন্ধন মুক্তির একমাত্র উপায়। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে সেই চরম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥

যথা—যেমন; **ক্রীড়-উপস্করাণাম্**—খেলার জিনিসপত্র; **সংযোগ**—মিলন; **বিগমৌ**—বিচ্ছেদ; **ইহ**—এই জগতে; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছাক্রমে; **ক্রীড়িতুঃ**—ক্রীড়াশীল; **স্যাতাম্**—হয়; **তথা**—তেমনি; **এব**—অবশ্যই; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

কোনও খেলোয়াড় যেমন তার নিজের ইচ্ছামতো তার খেলার জিনিসপত্র সাজায় আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছায় মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

তাৎপর্য

আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জানা কর্তব্য যে, বর্তমান যে বিশেষ অবস্থায় আমরা রয়েছি, তা আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ভগবানের ইচ্ছাক্রমে আয়োজিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। সে কথা *ভগবদ্গীতায় (১৩/২৩)* বর্ণিত হয়েছে, এবং তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতি

মুহূর্তের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত। কোন বিশেষ অবস্থায় আমাদের অধিষ্ঠিত করে তিনি আমাদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া অনুসারে ফলপ্রদান করেন।

ধনী ব্যক্তির পুত্র জন্মসূত্রে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়, তবে ধনীপুত্র হয়ে যে শিশু এসেছে, তারে সেখানে থাকবার মতো যোগ্যতা রয়েছে, এবং তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাকে সেখানে আনা হয়েছে। আর, কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে যখন শিশুটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন পিতা এবং পুত্রের সুখের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ভাবে সব কিছু ঘটে। ধনী অথবা দরিদ্র কারোরই এই ধরনের মিলন এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

এখানে উল্লিখিত খেলোয়াড় আর তার খেলার সামগ্রীর দৃষ্টান্তটি ভুল বোঝা উচিত নয়। কেউ যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারে যে, আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার কর্মফল অর্পণ করতে যখন পরমেশ্বর বদ্ধপরিকর, তখন খেলোয়াড়ের উপমা প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু সেই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাই চরম, এবং তিনি কোনও আইনের দ্বারা আবদ্ধ নন।

সাধারণত সকলকেই তাঁর কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ভগবানের ইচ্ছায়, কর্মফলের পরিবর্তনও সাধিত হয়। তবে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই সাধিত হতে পারে, অন্য আর কোন উপায়ে নয়।

তাই, এই শ্লোকে খেলোয়াড়ের দৃষ্টান্তটি যথাযথ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু করতে পারেন, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর কার্যকলাপে কখনোই কোন রকম ভুল ত্রুটি থাকে না।

শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রেই ভগবান কর্মের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করেন। *ভগবদ্গীতায় (৯/৩০-৩১)* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন, এবং সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করার শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভগবান যদি কারোর পূর্বকৃত কর্মফলের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হন, তা হলে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁর নিজের কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনি পরম পূর্ণ, এবং সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ৪৪

যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন চোভয়ম্ ।
সর্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যদিও; **মন্যসে**—তুমি মনে কর; **ধ্রুবম্**—পরম সত্য; **লোকম্**—মানুষ; **অধ্রুবম্**—অনিত্য; **বা**—অথবা; **ন**—না; **চ**—ও; **উভয়ম্**—অথবা তারা উভয়ে; **সর্বথা**—সর্ব অবস্থায়; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **শোচ্যাঃ**—অনুশোচনার বিষয়; **তে**—তারা; **স্নেহাৎ**—স্নেহের বশে; **অন্যত্র**—অন্যথায়; **মোহজাৎ**—মোহজাত।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও মানুষকে জীব রূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় অথবা নিত্য জ্ঞানময় মুক্ত অবস্থায়, জীব নিয়তই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই, তারা জীবের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম মনগড়া সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে। তবে প্রতিটি দার্শনিক মতবাদই স্বীকার করে যে, জীব নিত্য এবং পঞ্চভূতাত্মক তার জড় দেহটি অনিত্য। নিত্য জীব তার কর্মের ফল অনুসারে এক জড় দেহ থেকে আর এক জড় দেহে দেহান্তরিত হয়, এবং প্রতিটি জড় দেহই তার মূল আকৃতির দ্বারাই নশ্বরতা প্রাপ্ত হয়। তাই আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে কিংবা কোন বিশেষ অবস্থায় জড় দেহের বিনাশের ব্যাপারে কোন অনুশোচনা করার কারণ নেই।

অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আত্মা যখন জড়জাগতিক কারাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সেই আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়; এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থে বিশ্বাস করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিনিয়ত জড়ের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের

জন্য আমরা শোক করি না। পূর্বোল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ভগবানের দিব্য শক্তি অপ্রতিহত থাকে; তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন রকম ক্ষমতা কারোরই নেই, এবং তাই শোক করার কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৪৫

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ ।
কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **জহি**—ত্যাগ করে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **বৈক্লব্যম্**—মানসিক ব্যাকুলতা; **অজ্ঞান**—অজ্ঞানতা; **কৃতম্**—জনিত; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের; **কথম্**—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অনাথাঃ**—নিঃসহায়; **কৃপণাঃ**—কাতর জীবেরা; **বর্তেরন্**—বেঁচে থাকতে সক্ষম; **তে**—তারা; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

অতএব আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাজনিত আপনার এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবছেন, যারা অনাথ অসহায়, সেই সব জীবেরা আপনাকে ছাড়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করবে।

তাৎপর্য

যখন আমরা মনে করি, আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা অসহায় এবং আমাদের উপর নির্ভরশীল, তখন সেটা সবটাই আমাদের অজ্ঞানতার ফল। প্রতিটি জীব এই জগতে তার আয়ু অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। ভগবানের একটি নাম ভূতভৃৎ, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন। সকলেরই উচিত তার কর্তব্যকর্মই কেবল সম্পাদন করা, কারণ পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য আর কেউই কাউকে রক্ষা করতে পারে না। পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

কালকর্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথা পরম্ ॥ ৪৬ ॥

কাল—অন্তহীন সময়; **কর্ম**—কর্ম; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **অধীনঃ**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **দেহঃ**—জড় দেহ এবং মন; **অয়ম্**—এই; **পাঞ্চ-ভৌতিকঃ**—পঞ্চমহাভূত দ্বারা রচিত; **কথম্**—কিভাবে; **অন্যান্**—অন্যেরা; **তু**—কিন্তু; **গোপায়েৎ**—রক্ষা করতে পারেন; **সর্প-গ্রস্তঃ**—সর্পের দ্বারা আক্রান্ত; **যথা**—যেমন; **পরম্**—অন্যেরা।

অনুবাদ

এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের বশবর্তী। তার ফলে সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে?

তাৎপর্য

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচারাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের জন্য জগতের কোনও আন্দোলনই কারও কোন রকম মঙ্গল সাধন করতে পারে না, কারণ ঐগুলি সমস্তই পরা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের নির্দেশানুযায়ী মহাকাল এবং কর্মের অভিব্যক্তির দ্বারা বদ্ধ জীব সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে—সত্ত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত না হলে কেউ যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারে না। তাই রজো এবং তমোগুণের দ্বারা যে মানুষ প্রভাবিত, সে তার কার্যকলাপ সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। কেবল সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত মানুষই এই বিষয়ে কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

অধিকাংশ মানুষই রজো এবং তমোগুণাশ্রিত, এবং তাই তাদের পরিকল্পনা এবং প্রকল্পগুলি বলতে গেলে কারোরই কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অন্তহীন মহাকাল রয়েছে, যার প্রভাবে জড় জগতের প্রতিটি বস্তুরই পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা যদিও বা সাময়িকভাবে কারও কোন রকম মঙ্গ ল সাধন করতে পারি, কিন্তু কালক্রমে মহাকালের প্রভাবে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়।

একটিমাত্র কাজই কেবল এক্ষেত্রে করা সম্ভব, তা হল, যে-মহাকালকে কালসর্প অর্থাৎ গোখরো সাপের সাথে তুলনা করা হয়, যার দংশনে সর্বদাই নিশ্চিত মৃত্যু হয়, তার কবল থেকে মুক্ত থাকা। গোখরো সাপের দংশন থেকে কাউকেই বাঁচানো যায় না। গোখরো সাপের মতো সেই মহাকালের কবল থেকে, অর্থাৎ

তার সম্যক্ অভিব্যক্তি যে প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদি, তার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল *ভগবদ্গীতার (১৪/২৬)* অনুমোদন অনুসারে ভক্তিযোগের চর্চা করা।

লোকহিতকর কার্যকলাপের সর্বোত্তম প্রকল্প হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তির প্রচারে সকলকে নিয়োজিত করা, কারণ ভগবদ্ভক্তিই কেবল কাল, কর্ম এবং গুণ সমন্বিত জড়া প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। *ভগবদ্গীতা (১৪/২৬)* সুনিশ্চিতভাবে এই কথা সমর্থন করেছে।

শ্লোক ৪৭

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ ।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥ ৪৭ ॥

অহস্তানি—হস্তহীন; **সহস্তানাম্**—যাদের হাত রয়েছে; **অপদানি**—যাদের পা নেই; **চতুঃ-পদাম্**—চতুষ্পদ প্রাণী; **ফল্গূনি**—যারা দুর্বল; **তত্র**—সেখানে; **মহতাম্**—শক্তিশালী; **জীবঃ**—জীব; **জীবস্য**—জীবেদের; **জীবনম্**—জীবন ধারণের উপায়।

অনুবাদ

হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা, এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় জীবন সংগ্রামের এক সুসংবদ্ধ আইন রয়েছে, এবং শত পরিকল্পনা করেও তার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। যে সমস্ত জীব পরম সত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জড় জগতে এসেছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিভূ মায়াশক্তি নামে এক পরম শক্তির অধীন হয়ে থাকে, এবং এই দৈবী মায়ার কাজ হচ্ছে ত্রিতাপ দুঃখ দান করে জীবেদের নির্যাতন করা, যার একটি ক্রিয়া এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা।* বলবানের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি কারোরই নেই, এবং পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় দুর্বল, অধিকতর বলবান এবং সব চেয়ে বলবানের সুসংবদ্ধ ক্রমবিভাগ রয়েছে। বাঘ যদি কোন দুর্বল প্রাণীকে, কোন মানুষকেও খায়, তা হলে দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ সেটাই পরমেশ্বর ভগবানের আইন।

যদিও এই আইনবিধি অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্য প্রাণীদের ভরসাতেই মানুষ জীবন ধারণ করবে, তবু নীতিবোধের বিধিও একটা আছে, কারণ মানুষকে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। অন্য কোন পশুর পক্ষে এটা অসম্ভব।

মানব সত্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি, এবং সেই উদ্দেশ্যে ভগবানকে যা প্রথমে নিবেদন করা হয়নি, সেটা সে আহার করতে পারে না। ভক্তের নিবেদিত শাক-সব্জি, ফল-মূল, এবং শস্য থেকে প্রস্তুত সব রকমের খাদ্যদ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন। ফল, পাতা, এবং দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ভগবানকে নিবেদন করা যায়, এবং ভগবান সেই আহার্য গ্রহণ করার পর, ভক্ত সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে জীবন সংগ্রামের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ধীরে ধীরে লাঘব হয়ে যায়। এই কথা *ভগবদ্গীতায় (৯/২৬)* সমর্থিত হয়েছে।

যারা পশু-মাংস আহার করে, তারাও তাদের খাদ্য নিবেদন করতে পারে, তবে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে নয়; ধর্মীয় পূজা-অর্চনার বিশেষ কতকগুলি শর্তাধীনে তা পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রতিনিধিকে নিবেদন করা চলে। শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি মাংসাহারীদের পশু-মাংস আহারে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সুসংবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে তাদের এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই সেগুলি নির্দেশিত হয়েছে। কোন জীব তার থেকে বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা জুগিয়ে থাকে। কোনও অবস্থাতেই জীবন ধারণের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া কারও উচিত নয়, কারণ সর্বত্রই জীব রয়েছে এবং কোথাও কোন প্রাণী খাদ্যাভাবে অনাহারে থাকে না। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে তাঁর পিতৃব্যদের খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে হবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হতে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ জঙ্গলে যা শাক-সব্জি পাওয়া যায়, তা ভগবানকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করে তাঁরা জীবন ধারণ করতে পারেন এবং সেইভাবেই মুক্তিলাভের পন্থা উপলব্ধি করতে পারেন।

সবলের দ্বারা দুর্বলের আত্মসাৎ হল অস্তিত্ব রক্ষার প্রাকৃতিক আইনবিধি। বিভিন্ন জীবজগতে দুর্বলদের গ্রাস করার একটা প্রচেষ্টা সর্বদাই রয়েছে। জড়জাগতিক পরিস্থিতিতে কোনও রকম কৃত্রিম উপায়ে এই প্রবণতা প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কেবল পারমার্থিক বিধিনিয়মাদি চর্চার মাধ্যমে মানবসত্তার পারমার্থিক চেতনা জাগিয়ে তুলেই এই প্রবণতা প্রতিহত করা যেতে পারে।

মানুষ দুর্বল পশুকে হত্যা করবে আর সেই সঙ্গে অন্যদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরামর্শ দেবে, তা অবশ্যই পারমার্থিক বিধিনিয়মের নীতিসূত্রাবলী অনুসারে

অনুমোদন করা চলে না। মানুষ যদি পশুদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বেঁচে থাকতে না দেয়, তা হলে মানব সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশা সে করে কি করে? তাই সমস্ত অন্ধ নেতাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তারপর ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর জনগণের অন্তরে ভগবৎ-চেতনার বিকাশ না করে ভগবানের রাজ্য বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

শ্লোক ৪৮

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্ ।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৮ ॥

তৎ—অতএব; **ইদম্**—এই জগৎ-প্রকাশ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ; **একঃ**—এক এবং অদ্বিতীয়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মানম্**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **স্ব-দৃক্**—গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন; **অন্তরঃ**—অন্তরে; **অনন্তরঃ**—বাইরে; **ভাতি**—প্রকাশিত; **পশ্য**—দেখ; **তম্**—তাঁকেই কেবল; **মায়য়া**—তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা; **উরুধা**—বহু বলে মনে হয়।

অনুবাদ

অতএব হে রাজন্, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করেন, এবং যিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন, কারণ তিনি আনন্দময়। তাঁর তটস্থা শক্তি-সম্ভূত জীব গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তিতে অসংখ্য জীব রয়েছে। চিদ্‌জগৎ যেহেতু ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, সেই শক্তির অন্তর্গত জীবেরা বহিরঙ্গা শক্তির কলুষ থেকে মুক্ত এবং গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন।

গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন হলেও, জড় জগতের প্রভাবে কলুষিত জীবেরা তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বিকৃতভাবে প্রকাশিত, এবং তাই তারা এই জড় জগতে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

জড় জগতে জীবের এই সুখ-দুঃখের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী এবং তা আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারে না। জীব যে গুণগতভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন, সে কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই সে এই ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

অবশ্য অন্তরে ও বাইরে ভগবানের করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, যার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের অধঃপতিত অবস্থার সংশোধন করতে পারে। অন্তরে পরমাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঐকান্তিকভাবে যারা নিজেদের সংশোধন করতে আগ্রহী, সেই সকল জীবেদের সংশোধন করেন, এবং বাইরে সদ্‌গুরু এবং দিব্য শাস্ত্রাদিরূপে প্রকাশিত হয়ে তিনি তাদের সংশোধন করেন।

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে ভগবদ্-মুখী হওয়া উচিত, এবং পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা ক্রিয়ায় পতিত জীবদের সংশোধন করার কাজে তাঁকে সাহায্য করা উচিত। তাঁর আদেশেই কেবল গুরু হয়ে তাঁর সাথে সহযোগিতা করা উচিত।

কখনই কোন ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে, জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে গুরুগিরি করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবানের কাজে সাহায্যকারী ভগবদ্-ভাবনাময় সদ্-গুরু গুণগতভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন, আর যারা আত্ম-বিস্মৃত, তারা কেবল বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

তাই, তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, যে উদ্দেশ্যে ভগবান অবতরণ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে উন্মুখ হতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি উপদেশ দেন। সেটাই ছিল তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভাবায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **অয়ম্**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ; **অদ্য**—ইদানীং; **মহারাজ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা বা পিতা; **কাল-রূপঃ**—সর্বগ্রাসী কালরূপে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **অস্যাম্**—এই পৃথিবীতে; **অভাবায়**—বিনাশ করার জন্য; **সুর-দ্বিষাম্**—ভগবদ্-বিদ্বেষীদের।

অনুবাদ

হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্-বিদ্বেষীদের বিনাশ করার জন্য সর্বগ্রাসী কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

মানুষ দুই প্রকার, ঈর্ষাপরায়ণ এবং অনুগত। ভগবান যেহেতু সমস্ত জীবের পিতা, তাই ঈর্ষাপরায়ণ জীবেরাও তাঁর সন্তান, কিন্তু তারা অসুর নামে পরিচিত। কিন্তু যারা পরম পিতার অনুগত, তাদের বলা হয় সুর বা দেবতা, কারণ তারা জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত নয়।

অসুরেরা যে কেবল ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ভগবানের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, তাই নয়, তারা অন্য সমস্ত জীবেদের প্রতিও ঈর্ষাপরায়ণ। এই পৃথিবীতে যখন অসুরদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তখন মাঝে মাঝে ভগবান তাদের বিনাশ করে পাণ্ডবদের মতো দেবতাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

কালরূপে তাঁর প্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মোটেই ভয়ঙ্কর নন, পক্ষান্তরে তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, কিন্তু যারা অভক্ত, তাদের কাছে তিনি কালরূপে প্রকাশিত হন। কালরূপী ভগবানের তাঁর এই করাল রূপ অসুরদের কাছে মোটেই সুখকর নয়, তাই তাঁর হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার ভয় থেকে স্বস্তি অনুভব করার জন্য তারা তাঁকে নিরাকার বলে কল্পনা করে।

শ্লোক ৫০

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে ।
তাবদ্ যূয়মবেক্ষধ্বং ভবেদ্ যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥

নিষ্পাদিতম্—সম্পাদিত; **দেব-কৃত্যম্**—দেবতাদের সাহায্যার্থে করণীয়; **অবশেষম্**—অবশিষ্ট; **প্রতীক্ষতে**—প্রতীক্ষা করছেন; **তাবৎ**—সেই সময় পর্যন্ত; **যূয়ম্**—তোমরা সমস্ত পাণ্ডবেরা; **অবেক্ষধ্বম্**—প্রতীক্ষা করা; **ভবেৎ**—হোক; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন, এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ

পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন, সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ দেবতারা যখন কেবল ভগবদ্-বিদ্বেষী নয়, ভক্তবিদ্বেষী অসুরদের দ্বারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হন, তখন তাঁদের সাহায্য করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান চিৎজগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক, তাঁর নিজ ধাম (কৃষ্ণলোক) থেকে অবতরণ করেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবেরা ভগবানের অনুকরণে এই জড় জগতের মধ্যে যা কিছু দেখছে, সব কিছুর উপরেই আধিপত্য করার প্রবল বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছায় জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সকলেই নকল ভগবান সাজার চেষ্টা করছে, এই ধরনের নকল ভগবানদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, এবং এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাধারণত বলা হয় অসুর।

এই পৃথিবীতেও অসুরদের সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন ভগবদ্ভক্তদের কাছে এই পৃথিবী নরক হয়ে ওঠে। অসুরদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মানুষেরা, উচ্চতর গ্রহলোকের দেবতারা এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা সাধারণত পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, এবং তখন ভগবান তাঁর ধাম থেকে স্বয়ং অবতরণ করেন অথবা তাঁর ভক্তদের নিযুক্ত করেন মানব সমাজের, এমন কি পশু সমাজেরও, অধঃপতিত পরিস্থিতির সংস্কার সাধন করার জন্য।

অসুরদের প্রভাবে এই ধরনের বিপর্যয় কেবল মানব সমাজেই নয়, অসুর সমাজে, পক্ষী সমাজে, অন্যান্য প্রাণী সমাজে, এমন কি স্বর্গের দেবতাদের সমাজেও উপস্থিত হয়। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রমুখ অসুরদের সংহার করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে প্রায় সমস্ত অসুরেরাই ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল।

এখন তিনি তাঁর স্বীয় বংশ, যদুবংশ, যা তাঁরই ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, তা ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছিল। তাঁর নিত্য ধামে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। বিদুরের মতো, নারদ মুনিও আসন্ন যদুবংশ ধ্বংসের কথা প্রকাশ করেননি, কিন্তু পরোক্ষভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েদের কাছে ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এবং ভগবানের অপ্রকট লীলা-বিলাস পর্যন্ত তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন।

শ্লোক ৫১

ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্যা চ স্বভার্যয়া ।
দক্ষিণেন হিমবত ঋষিণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫১ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ধৃতরাষ্ট্র; **সহ**—সঙ্গে; **ভ্রাত্রা**—তাঁর ভ্রাতা বিদুর; **গান্ধার্যা**—গান্ধারীও; **চ**—এবং; **স্ব-ভার্যয়া**—তাঁর নিজ পত্নী; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **হিমবতঃ**—হিমালয় পর্বতের; **ঋষিণাম্**—ঋষিদের; **আশ্রমম্**—আশ্রয়ে; **গতঃ**—গিয়েছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর ভ্রাতা বিদুর এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে।

তাৎপর্য

শোকগ্রস্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নারদ মুনি প্রথমে দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং তারপর তিনি তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বর্ণনা করতে শুরু করেন, যা তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুসারে তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে শুরু করেন।

শ্লোক ৫২

স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ ।
সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫২ ॥

স্রোতোভিঃ—স্রোতের দ্বারা; **সপ্তভিঃ**—সপ্তভাগে; **যা**—যে নদী; **বৈ**—অবশ্যই; **স্বর্ধুনী**—পবিত্র গঙ্গা নদী; **সপ্তধা**—সপ্তধারা; **ব্যধাৎ**—সৃষ্টি হয়েছে; **সপ্তানাম্**—সপ্তর্ষিদের; **প্রীতয়ে**—সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **সপ্ত-স্রোতঃ**—সপ্তপ্রবাহ; **প্রচক্ষতে**—নামধেয় হয়েছে।

অনুবাদ

সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে।

শ্লোক ৫৩

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিন্ যথাবিধি ।
অদ্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৫৩ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **অনুসবনম্**—নিয়মিতভাবে তিনবার (সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়); **তস্মিন্**—সেই সপ্তধারায় বিভক্ত গঙ্গায়; **হুত্বা**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করে; **চ**—ও; **অগ্নীন্**—অগ্নিতে; **যথা-বিধি**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **অপ্-ভক্ষঃ**—কেবলমাত্র জলপান করে; **উপশান্ত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **আত্মা**—ইন্দ্রিয় এবং মন; **সঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **আস্তে**—অবস্থান করবেন; **বিগত**—বিরত; **এষণঃ**—পরিবারের মঙ্গল সাধনে চিন্তা।

অনুবাদ

সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র-কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্ম চেতনায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে সংযত করার গতানুগতিক পন্থা হল যোগ প্রক্রিয়া। যোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি হচ্ছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং অবশেষে পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে সমাধি। এইভাবে গতানুগতিক পন্থায় আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, যতদূর সম্ভব উপবাস করা, আসনে উপবিষ্ট হয়ে মনকে অধ্যাত্ম চিন্তায় একাগ্র করা এবং সেই ভাবে ধীরে ধীরে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিধি অনুশীলন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

জড় অস্তিত্ব মানে মায়িক জড় বিষয়ে মগ্ন হওয়া। ঘরবাড়ি, দেশভূমি, পরিবার-পরিজন, সমাজ-সম্প্রদায়, সন্তান-সন্ততি, বিষয়-সম্পত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হল আত্মার কয়েকটি আবরণ, এবং যোগ প্রক্রিয়া এই সমস্ত মায়িক চিন্তা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে পরমাত্মার প্রতি আত্মাকে উন্মুখ করে।

জড় বিষয়ের সান্নিধ্য এবং শিক্ষার প্রভাবে আমরা কেবল অনিত্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার শিক্ষা লাভ করি, কিন্তু যোগ হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হওয়ার পন্থা।

আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগী এবং যোগ পদ্ধতি কেবল কতকগুলি যাদু কৌশল প্রদর্শন করে, এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের সেই কপটতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, অথবা তারা স্থূল জাগতিক শরীরটাকে রোগমুক্ত করবার সস্তা পন্থা বলে যোগ পদ্ধতিকে মনে করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ পদ্ধতি হচ্ছে জীবন সংগ্রামে আহরিত হয়েছে যে সমস্ত বিষয়-বাসনা, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। ধৃতরাষ্ট্র বরাবর পাণ্ডবদের প্রতারণা করে তাঁর নিজের পুত্রদের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত বিষয়াসক্ত মানুষ এইভাবেই সচরাচর আচরণ করে থাকে। সে বুঝতে পারে না কিভাবে এই ধরনের মনোবৃত্তি তাকে স্বর্গ থেকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের কৃপায় দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর স্থূল মায়ার বন্ধন সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলেই তিনি পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আকাশ গঙ্গার ধারায় পবিত্র স্থানে তাঁর পারমার্থিক প্রগতির কথা নারদ মুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কোন কিছু আহার না করে কেবল জলপান করে থাকলে তাকেও উপবাস বলে বিবেচনা করা হয়। পারমার্থিক প্রগতির পথে এই ধরনের উপবাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মূর্খ মানুষ কোন রকম বিধি-নিয়মাদি অনুশীলন না করেই যোগী হতে চায়। যে মানুষ তার জিহ্বাকে দমন করতে পারে না, সে কখনই যোগী হতে পারে না। যোগী এবং ভোগী সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আহার ও পানাসক্ত ভোগীরা কখনই যোগী হতে পারে না, কারণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে আহার এবং পান করা যোগীদের পক্ষে অনুচিত।

আমরা এখানে দেখতে পাই ধৃতরাষ্ট্র কিভাবে কেবলমাত্র জল গ্রহণ করে, এবং সমাহিত চিত্তে এক পবিত্র পারমার্থিক পরিবেশে উপবেশন করে যোগ অনুশীলন শুরু করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৪

জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্ত-রজঃসত্ত্বতমোমলঃ ॥ ৫৪ ॥

জিত-আসনঃ—যিনি আসনের পন্থা আয়ত্ত করেছেন; **জিত-শ্বাসঃ**—যিনি শ্বাস গ্রহণের পন্থা আয়ত্ত করেছেন; **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাহার করেছেন; **ষট্**—ছয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভাবনয়া**—ভাবনায় মগ্ন; **ধ্বস্ত**—জয় করেছেন; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **মলঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

যিনি যৌগিক আসনের পদ্ধতি এবং শ্বাস-প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে ছয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

তাৎপর্য

যোগের প্রাথমিক অনুশীলন হচ্ছে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি। যোগের এই সমস্ত অঙ্গের অনুশীলনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কৃতকার্য হতে হয়েছিল, কারণ তিনি এক পবিত্র স্থানে উপবেশন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ধ্যানে একাগ্র চিত্ত হয়েছিলেন। এই ভাবে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

এই পদ্ধতির অনুশীলন ভক্তদের সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। জড়া প্রকৃতির সর্বোচ্চ গুণ যে সত্ত্বগুণ, তাও জড় বন্ধনের কারণ, সুতরাং রজো এবং তমোগুণের কথা বলে আর কী হবে! রজো এবং তমোগুণ জড় সুখ ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করে, এবং এক তীব্র কাম-বাসনার অনুভূতি তখন ধন-সম্পদ এবং শক্তি সঞ্চয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে।

যিনি এই দু'টি জঘন্য বৃত্তি জয় করে সত্ত্ব গুণের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তিনি জ্ঞান এবং নীতিবোধের এই অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দমন করতে পারেন না।

কিন্তু যিনি উল্লিখিতভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

ভক্তিযোগের পন্থায়, তাই সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করা হয়। তার ফলে যোগাভ্যাসকারী আর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন না।

ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় বিষয় থেকে সংবরণ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় *প্রত্যাহার* এবং এই পন্থাকেই বলা হয় *প্রাণায়াম,* যা চরমে *সমাধি* বা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৫৫

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্ ।
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥ ৫৫ ॥

বিজ্ঞান—পবিত্র সত্তা; **আত্মনি**—বুদ্ধিতে; **সংযোজ্য**—যথাযথভাবে সংস্থাপন করে; **ক্ষেত্রজ্ঞে**—জীবে; **প্রবিলাপ্য**—সংযুক্ত হয়ে; **তম্**—তাকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **আত্মানম্**—শুদ্ধ আত্মা; **আধারে**—আশ্রয়ে; **ঘট-অম্বরম্**—ঘটাকাশ; **ইব**—মতো; **অম্বরে**—মহাকাশে।

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধির সাথে আপন শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে এবং তারপরে পরম ব্রহ্মের সাথে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতার জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্তার মাঝে সাযুজ্য লাভ করতে হবে। জড়জাগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিদাকাশে উন্নীত হতে হবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সেবা সহযোগিতায় বিমুখ হয়ে জীব মহত্তত্ত্ব নামক জড়া প্রকৃতির উপাদানের সংস্পর্শে আসে, এবং মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বিকাশের মাধ্যমে তার মিথ্যা ভ্রান্ত আত্মপরিচয় সৃষ্টি হয়। এর ফলে তার চিন্ময় সত্তা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। যৌগিক প্রক্রিয়ায় যখন মানুষের শুদ্ধ আত্ম পরিচয় উপলব্ধি হয়, তখন পুনরায় পঞ্চ স্থূল উপাদানগুলি এবং মন, বুদ্ধির মতো সূক্ষ্ম উপাদানগুলি মহত্তত্ত্বে অর্পণ করে আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এইভাবে মানুষকে মহত্তত্ত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় সমাহিত হতে হয়। ভাষান্তরে, তাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, সে গুণগতভাবে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন, এবং এইভাবে তার বিশুদ্ধ আত্ম পরিচয়গত বুদ্ধির দ্বারা সে জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়।

এইটিই পারমার্থিক আত্ম-পরিচয় উপলব্ধির সর্বোচ্চ সার্থকময় স্তর, যা বিদুর এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহে ধৃতরাষ্ট্র লাভ করেছিলেন। বিদুরের সাথে ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল এবং যখন তিনি বিদুরের নির্দেশ অনুসারে বাস্তবিকই অনুশীলনাদি করতে শুরু করেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সর্বোচ্চ সার্থক সিদ্ধিলাভের পর্যায় স্তর অর্জনে সাহায্য করেন।

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড়জাগতিক আকাশের কোনও গ্রহলোকে বাস করেন না, এমন কি জড়া প্রকৃতির উপাদানগুলির সঙ্গে কোন রকম সংযোগও তিনি অনুভব করেন না। পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপগত সমভাবাপন্ন আগ্রহ-অনুরাগের পারমার্থিক স্রোতধারায় সঞ্জীবিত হয়ে, তাঁর তথাকথিত জড় শরীরটির অস্তিত্ব থাকে না, এবং তাই তিনি মহত্তত্ত্ব প্রসূত সামগ্রিক কলুষ থেকে চিরতরে মুক্ত হন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির সপ্ত আবরণের অতীত হয়ে, তিনি চিদাকাশে সর্বদা বিরাজ করেন। বদ্ধ জীবাত্মারা জড় জগতের আবরণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে মুক্ত জীবাত্মারা সেই আবরণের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৫৬

ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ ।
নিবর্তিতাখিলাহার আস্তে স্থানুরিবাচলঃ ।
তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সন্ন্যস্তাখিলকর্মণঃ ॥ ৫৬ ॥

ধ্বস্ত—ধ্বংস হয়ে; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **উদর্কঃ**—প্রতিক্রিয়া; **নিরুদ্ধ**—সংযত হয়ে; **করণ-আশয়ঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **নিবর্তিত**—নিবৃত্ত; **অখিল**—সমস্ত; **আহারঃ**—ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণীয় বিষয়সমূহ; **আস্তে**—আসনে; **স্থাণুঃ**—নিশ্চল; **ইব**—মতো; **অচলঃ**—স্থির; **তস্য**—তাঁর; **অন্তরায়ঃ**—বিঘ্ন; **মা এব**—কখনই সেই রকম নয়; **অভূঃ**—হওয়া; **সন্ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করে; **অখিল**—সর্বপ্রকার; **কর্মণঃ**—জাগতিক কর্তব্যসমূহ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভোক্তার বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণ রূপ জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার

ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থানুর মতো নিশ্চলভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে। সব রকম জড়জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করবার পরে, সেই পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে, তাঁকে অবিচল হয়ে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

তাৎপর্য

যৌগিক প্রক্রিয়ায় ধৃতরাষ্ট্র সব রকম জড় প্রভাব থেকে নিবৃত্ত হওয়ার স্তর লাভ করেছিলেন। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব জীবকে জড় বিষয় ভোগের অক্লান্ত বাসনার অভিমুখী করে। কিন্তু যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভ্রান্ত সুখ-ভোগের বাসনা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে।

প্রতিটি ইন্দ্রিয় সর্বদাই বিষয় আহরণের অন্বেষণ করে, এবং তার ফলে বদ্ধ জীবাত্মা চতুর্দিক থেকে পর্যুদস্ত হয় এবং কোন প্রচেষ্টাতেই স্থির হওয়ার সুযোগ পায় না।

যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর পিতৃব্যকে গৃহে আনার চেষ্টা করে তাঁর পিতৃব্যের পারমার্থিক প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। তিনি এখন সব রকম জড় আসক্তির অতীত।

জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থাকে, কিন্তু এই সব জড় গুণের ঊর্ধ্বে এক চিন্ময় গুণ বিরাজ করে, যা চিরন্তন শাশ্বত সম্যক্। *নির্গুণ* মানে প্রতিক্রিয়ারহিত। পরা প্রকৃতির চিন্ময় গুণ এবং তার প্রতিক্রিয়া অভিন্ন; তাই সেই চিন্ময় গুণকে জড়া প্রকৃতির বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গুণের থেকে ভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করার জন্য *নির্গুণ* শব্দটির ব্যবহার করা হয়।

জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ করার পরে, মানুষ চিন্ময় মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পায়, এবং চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা নির্দেশিত কার্যকলাপকে বলা হয় *ভক্তি*। তাই ভক্তি হচ্ছে পরম তত্ত্বের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত নির্গুণ ক্রিয়া।

শ্লোক ৫৭

স বা অদ্যতনাদ্ রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—খুব সম্ভবত; **অদ্য**—আজ; **তনাৎ**—থেকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পরতঃ**—পরে; **পঞ্চমে**—পঞ্চম; **অহনি**—দিনে; **কলেবরম্**—দেহ; **হাস্যতি**—ত্যাগ করবেন; **স্বম্**—তাঁর নিজস্ব; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **ভস্মী**—ভস্মে; **ভবিষ্যতি**—পরিণত হবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আজ থেকে খুব সম্ভবত পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন, এবং তাঁর সেই দেহ ভস্মে পরিণত হবে।

তাৎপর্য

নারদমুনির ভবিষ্যদ্বাণী যুধিষ্ঠির মহারাজকে, তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র যেখানে ছিলেন, সেখানে যাওয়া থেকে নিরস্ত করেছিল, কারণ যোগবলে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার পরেও ধৃতরাষ্ট্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। নারদমুনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহ আপনা থেকেই ভস্মে পরিণত হবে। যোগবলে এই ধরনের সিদ্ধি লাভ করা যায়। যোগী স্বেচ্ছায় তাঁর দেহত্যাগ করতে পারেন, এবং তাঁর বর্তমান দেহটিকে স্বতঃ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভস্মীভূত করে তাঁর ঈপ্সিত যে কোন গ্রহলোকে চলে যেতে পারেন।

শ্লোক ৫৮

দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে ।
বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনু বেক্ষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

দহ্যমানে—জ্বলন্ত; **অগ্নিভিঃ**—অগ্নির দ্বারা; **দেহে**—শরীর; **পত্যুঃ**—পতির; **পত্নী**—পত্নী; **সহ-উটজে**—পর্ণকুটির সহ; **বহিঃ**—বাইরে; **স্থিতা**—অবস্থিত; **পতিম্**—পতির; **সাধ্বী**—সতী; **তম্**—সেই; **অগ্নিম্**—অগ্নিতে; **অনু বেক্ষ্যতি**—গভীর মনোযোগে দর্শন করতে করতে প্রবিষ্ট হবেন।

অনুবাদ

বাইরে থেকে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে পতিব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।

তাৎপর্য

গান্ধারী ছিলেন এক আদর্শ সাধ্বী নারী, তাঁর পতির নিত্য সহচরী, এবং তাই তিনি যখন দেখলেন যে, যোগাগ্নিতে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ দগ্ধ হচ্ছে, তখন তিনি হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর শতপুত্র হারিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, এবং

অরণ্যে তিনি দেখলেন যে, তাঁর পরম প্রেমাস্পদ পতিও দগ্ধ হচ্ছেন। এবার তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ বোধ করলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পতির অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে মৃত্যুপথে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হলেন।

পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর এইভাবে মৃত পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করাকে বলা হয় সতীপ্রথা, এবং কোন রমণীর পক্ষে এটি অতীব গৌরবময় কার্য বলে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে এই সতীপ্রথা এক জঘন্য অপরাধমূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ অনিচ্ছুক রমণীকেও জোর করে এই পবিত্র অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করা হত। অধঃপতিত যুগে কোন রমণীর পক্ষে গান্ধারীর এবং পুরাকালের অন্যান্য রমণীর মতো পাতিব্রত্য অবলম্বন করে সতীপ্রথা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

গান্ধারীর মতো সতী নারীর কাছে তাঁর পতির বিরহ-বেদনা অগ্নিতে প্রজ্বলিত হওয়ার থেকেও অধিক দুঃখদায়ক। এই ধরনের কোনও মহিলা স্বেচ্ছায় সতীপ্রথা অবলম্বন করতে পারেন, এবং তাতে কারও দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ থাকে না। এই প্রথাটি যখন একটি গতানুগতিক সংস্কারে পরিণত হল এবং এই প্রথা অনুসরণে কোনও মহিলার ওপরে বলপ্রয়োগ করা হত, বাস্তবিকই এটা তখন দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত হল, এবং তাই রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে এই প্রথা বন্ধ করা হয়।

নারদ মুনির এই ভবিষ্যদ্বাণী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর বিধবা পিতৃব্য-পত্নীর কাছে যেতে নিরস্ত করেছিল।

শ্লোক ৫৯

বিদুরস্তু তদাশ্চর্যং নিশাম্য কুরুনন্দন ।
হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্ গন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৯ ॥

বিদুরঃ—বিদুরও; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—সেই ঘটনা; **আশ্চর্যম্**—অতি অদ্ভুত; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **কুরুনন্দন**—হে কুরুকুল সন্তান; **হর্ষ**—আনন্দ; **শোক**—বিষাদ; **যুতঃ**—প্রভাবিত হয়ে; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **গন্তা**—চলে যাবেন; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **নিষেবকঃ**—সেবার্থে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার জন্য সেই পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থান পরিত্যাগ করবেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগীর মতো তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের অনির্বচনীয় দেহত্যাগ দেখে বিদুর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ পূর্ব জীবনে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অত্যন্ত বিষয়াসক্ত। অবশ্য বিদুরের কৃপার প্রভাবেই তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন। তাই এই কথা জেনে বিদুরের আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভ্রাতাকে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে না পারায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন।

বিদুরের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি কারণ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, ভগবানের চরণে অপরাধের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর। বিদুর অবশ্য তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে কৃপা করতে খুবই উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন, যে ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বজীবন ছিল অত্যন্ত বিষয়াসক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কৃপার ফল অবশ্য নির্ভর করে বর্তমান জীবনে ভগবানের উপর; তাই ধৃতরাষ্ট্র কেবল মুক্তি লাভ করেছিলেন, ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি, যা বহু জন্মের মুক্তির পর লাভ করা যায়।

বিদুর অবশ্যই তাঁর ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বিষাদ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল তীর্থভ্রমণে বের হওয়া। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তার জীবিত পিতৃব্য বিদুরকে ফিরিয়ে আনারও কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

শ্লোক ৬০

ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বাজহাচ্ছুচঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **অথ**—তারপর; **আরুহৎ**—আরোহণ করেছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **সহ**—সহিত; **তুম্বুরু**—বীণা; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির মহারাজ; **বচঃ**—বাণী; **তস্য**—তাঁর, **হৃদি-কৃত্বা**—হৃদয়ে ধারণ করে; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **শুচঃ**—সমস্ত শোক।

অনুবাদ

এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হস্তে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজও নারদের বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শোক পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় এক চিন্ময় দেহ লাভ করার ফলে শ্রীনারদ মুনি এক চিরন্তন মহাকাশচারী। তিনি জড় জগৎ এবং চিদ্‌জগতের যে কোনও স্থানে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন এবং নিমেষের মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যে যে কোন গ্রহে যেতে পারেন।

দাসী পুত্ররূপে তাঁর পূর্ব জীবনের কথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি নিত্য মহাকাশচারীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন এবং সর্বত্র বিচরণের স্বাধীনতা তাঁর ছিল। তাই যৌগিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা না করে, নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন অতি পুণ্যবান নৃপতি, এবং তাই তিনি প্রায়ই নারদ মুনির দর্শন পেতেন। যাঁরা নারদ মুনিকে দর্শন করতে চান, তাঁদের সর্ব প্রথমে পুণ্যবান হতে হবে এবং নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

ইতিঃ "ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।